বন্দিমুক্তির আবেদনের ভঙ্গিমা প্রসঙ্গে
একটি সংলাপ পৃষ্ঠা ২
যদি ভালোবাসো পৃথিবীকে পৃষ্ঠা ৩
এই একটাই পৃথিবী আমাদের পৃষ্ঠা ৫
বিপন্ন বিশ্বপ্রকৃতি পৃষ্ঠা ৬
সামগ্রিক পরিবেশ সহায়ক কৃষিই এগোনোর পথ পৃষ্ঠা ৮
বসুন্ধরা দিবসের সভা
একটি বিবরণ পৃষ্ঠা ১০
পাবলিক লাইব্রেরি, ছোটো পত্রিকা এবং সাম্প্রতিক সরকারি নির্দেশনামা পৃষ্ঠা ১৬
উচ্ছেদ এবং পুনর্বাসন : কিছু ভাবনা পৃষ্ঠা ২২
মন্থন সাময়িকী : ২০১১ সালের আয়-ব্যয়ের হিসেব পৃষ্ঠা ২৮

মার্চ-এপ্রিল ২০১২ ☐ত্রয়োদশ বর্ষ ☐দ্বিতীয় সংখ্যা ☐৬ টাকা

মন্থন
সাময়িকী

ধরিত্রীর দৃষ্টি থেকে ...

পৃথিবীর দৃষ্টি থেকে দেখার অভ্যাস আমার ছিল না। পৃথিবী একটা গ্রহ। তার অপর নাম ধরিত্রী, ধরা, বসুন্ধরা ...। এইসব নামকরণের মধ্যে রয়েছে অনেকগুলো ধারণা বা বিশ্বাস। তাকে মাতৃরূপে দেখা এবং এমন এক পরিসর হিসেবে দেখা, যা আমাদের ধারণ করে রাখে। 'আমাদের' বলতে শুধু মানুষ নয়, সমস্ত প্রাণ-অপ্রাণের সমাহার।

যখন আমরা বসুন্ধরা বা ধরিত্রী দিবস পালন করছি, তখন কলকাতার পূর্বপ্রান্তে নোনাডাঙায় উচ্ছেদ হওয়া মানুষের টানাপোড়েন চলছে। একটা যেন লোভের জিব এগিয়ে আসে! যত কিছু মিঠে ছিল গ্রাস করেও তৃপ্ত নয় সে, নোনা ডাঙাটুকুও ওর চাই! আমেরিকার হালফিল অকুপাই আন্দোলনে আওয়াজ উঠেছে, কর্পোরেট গ্রিড-এর বিরুদ্ধে। কিন্তু খেয়াল করলে বেশ বুঝতে পারি, কর্পোরেট মানে শুধু আমার শরীরের বাইরের কোনো সত্ত্বাই নয়, গ্রিড বা লোভ শুধু কোনো দাপুটে ব্যবসায়ীর নয়, এ আমার প্রবৃত্তি। কর্পোরেট আজ শুধু কিছু বিশ্বমাপের ব্যবসা-সংগঠনই নয়, সরকার দল এনজিও পাড়ার ক্লাব সমাজসেবা সবকিছুর মধ্যেই কর্পোরেট-মেজাজ।

আজ নোনাডাঙায় কে কত বেশি আন্দোলন করবে, কে কত বেশি বুদ্ধিজীবীকে শামিল করবে, কে কত মিডিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, তা নিয়েও যেন প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতা! সেটাও তো এক কর্পোরেট গুণই বটে!

সকলেরই মুখে এক বুলি, নোনাডাঙার বস্তিবাসীদের পুনর্বাসন চাই! পুনর্বাসন মানে? সরকার আর বড়োলোকেদের দয়া চাই। চাইছি করুণা, অথচ কর্পোরেট কায়দায়! যে মানুষ (কিংবা কোনো প্রাণ) এই পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছে, তার বেঁচে থাকার অধিকার কি কোনো সরকার, কোনো আইন, কোনো রাষ্ট্র কেড়ে নিতে পারে? হ্যাঁ পারে — গায়ের জোরে, ক্ষমতার জোরে, অন্যায়ভাবে পারে। কিন্তু পৃথিবী তা মানবে কেন? তার ধর্ম তো একটাই, প্রাণ আর অপ্রাণকে ধারণ করা। উচ্ছেদ করা তার ধর্ম নয়। আমি যদি পুনর্বাসন নিয়ে ওকালতি করি, তাহলে আমি উচ্ছেদের অধিকারের পক্ষে।

আন্দোলনকারী বন্ধু বলবেন, আপনি অবাস্তব কথা বলছেন। উচ্ছেদ হয়ে গেছে যারা, তাদের পুনর্বাসন ছাড়া আর গতি কী?

আমি বলব, বস্তিবাসীরা উচ্ছেদ হতে চায়নি। তাদের গায়ের জোরে উচ্ছেদ করা হয়েছে। তারা সাময়িকভাবে নিরুপায় হয়ে সরকারি পুনর্বাসনকে মেনেও নিতে পারে। কিন্তু আপনি বা আমি, একজন সহানুভূতিশীল বাইরের বন্ধু হিসেবে কোন বিচারে পুনর্বাসনের কর্পোরেট আগ্রাসী বুলি আওড়াব? বলুন তো, স্বাধীনতার পর থেকে যত উন্নয়নের কাজ হয়েছে — ডিভিসি থেকে শুরু করে নর্মদা বাঁধ — কোথায় মানুষ স্বস্তিতে বাঁচার মতো পুনর্বাসন পেয়েছে? কেন মিছে স্তোকবাক্য আওড়াব? কেন আমার মতোই আর একজন মানুষকে দয়া-করুণা করব?

আমি বাঁচতে চাই। যে-আমি এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছি, উপযুক্ত বাসস্থান-জীবিকা-অন্নসংস্থান তার প্রকৃতিগত অধিকার। আজ সারা পৃথিবী

জুড়েই এই আওয়াজ উঠছে।

বন্দিমুক্তির আবেদনের ভঙ্গিমা প্রসঙ্গে
একটি সংলাপ

নোনাডাঙায় বস্তি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দফায় দফায় গ্রেপ্তারির ঘটনা ঘটে। বেশ কিছু মানুষকে বন্দি করেও রাখা হয়। এই বন্দিদের মুক্তির জন্য দেশ–বিদেশের বুদ্ধিজীবী ও নাগরিকদের স্বাক্ষরিত আবেদন পাঠানো হয় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি পদাধিকারীদের কাছে। এমনই একটি আবেদন পাঠানো হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের কাছে। বড়ো মিডিয়া নোনাডাঙার উচ্ছেদ হওয়া মানুষের দুর্ভোগ এবং তাদের প্রতিরোধের সংবাদকে গুরুত্ব না দিলেও 'ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে ড. পার্থসারথী রায়ের মুক্তির জন্য নোয়াম চমস্কির আবেদন'–কে যোগ্য সংবাদ হিসেবে গুরুত্ব দেয়! কিন্তু এই আবেদনের রাজনৈতিক ভঙ্গিমা প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্বাক্ষরকারী ও সহানুভূতিশীল মানুষের সঙ্গে আমরা কিছু কথা বলতে চাই। আমরা কথা শুরু করেছি ইন্টারনেট যোগাযোগের মাধ্যমে। এই পত্রিকার পাঠকসমাজের মাধ্যমেও সেই কথাবার্তা চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করছি। ২৫ এপ্রিল থেকে শুরু হওয়া সংলাপে যে চিঠিপত্র এসেছে, স্থানাভাবে শেষের দিকের বেশ কয়েকটি সরিয়ে রাখতে হল। এজন্য আমরা দুঃখিত। বঙ্গানুবাদ : জিতেন নন্দী

২৫ এপ্রিল ২০১২

নোয়াম চমস্কি সমীপেষু

ড. পার্থসারথী রায় এবং অন্যান্যদের গ্রেপ্তারি নিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে আপনি এবং অন্য বিজ্ঞানী, বিদ্বজ্জন ও সমাজকর্মীরা স্বাক্ষর করে যে চিঠি পাঠিয়েছেন, সেই বিষয়ে আমরা আপনার কাছে লিখছি। বিনায়ক সেনের ঘটনার পরে ভারতের বিষয়ে এবং নন্দীগ্রামের ঘটনার পরে পশ্চিমবঙ্গের বিষয়ে আপনার কন্ঠস্বর আজ আবার আমরা শুনতে পেলাম। এটা আমাদের কাছে খুবই উৎসাহব্যঞ্জক।

বর্তমান উদ্বেগের বিষয় হল নোনাডাঙার বস্তি উচ্ছেদ। এটা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। জমি থেকে, অরণ্য থেকে, বাসস্থান থেকে ধারাবাহিকভাবে উচ্ছেদ চলছে ছত্তিশগড়, উড়িষ্যা, মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ড, দিল্লি এবং ভারতের সমস্ত রাজ্যেই। পশ্চিমবঙ্গেও অতীতের বামপন্থী জমানায় বা বর্তমান অ–বাম জমানায় এর কোনো ব্যতিক্রম দেখা যায়নি।

রাষ্ট্রের মদতে উচ্ছেদ ছাড়াও, কেন্দ্র ও রাজ্যের একের পর এক সরকারের কর্পোরেট–পন্থী নীতিসমূহের তাড়নায় মানুষকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। সেটা বেশ ব্যাপক আকারের। ভারতের কৃষকদের ওপর এক জাতীয় কমিশন (ন্যাশনাল কমিশন অন ফার্মার্স) সম্প্রতি রিপোর্ট করেছে, এদেশের ৪০% কৃষক চাষের কাজ ছেড়ে দিতে চায়। চাষের খরচের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি এবং পরিবেশগত অবনমনের ফলে তারা এতটাই ভেঙে পড়েছে। এই অস্বাভাবিক লক্ষণের পরিণাম হল, পরিবেশগত ও আর্থিক কারণে উদ্বাস্তু হওয়া পঁচিশ কোটি মানুষের স্রোত শহরের বস্তিতে প্রবেশ করছে।

যারা উচ্ছেদের এই কঠোর নির্মমতার শিকার, তারা প্রতিরোধ করছে। তাদের পাশে দাঁড়াচ্ছে বহু সহানুভূতিশীল মানুষ এবং সংগঠন। বহু ক্ষেত্রে সরকারি ক্ষমতায় না–থাকা বিরোধী দলগুলি তাদের নীতি–নিরপেক্ষভাবে এই প্রতিরোধ আন্দোলনে সামান্য মদত করে।

ইদানীংকালে কলকাতার পূর্বভাগে কলকাতা মেট্রোপলিটান ডেভেলপমেন্ট অথরিটি কমপক্ষে এক হাজার হকারদের দোকান এবং একটি বস্তি ভেঙে দিয়েছে। বসতি ঝুপড়িগুলো বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে আগুন জ্বালিয়ে তছনছ করা হয়েছে, লুঠপাট চালানো হয়েছে। এক হাজারের বেশি গরিব মানুষ তাদের সামান্য সম্বল হারিয়েছে। শিশু, প্রসূতি মহিলা এবং বৃদ্ধবৃদ্ধা সহ একশোর বেশি মানুষ গৃহহীন হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই আক্রান্ত মানুষ প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছে। হকাররা তাদের হারানো দোকানের জন্য কিছু ব্যক্তি ও হকার সংগঠনের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছে। গৃহহীন মানুষেরা সাহায্য পেয়েছে কিছু বামপন্থী সংগঠন (মজদুর ক্রান্তি পরিষদ, সিপিআইএমএল–লিবারেশন, মাতঙ্গিনী মহিলা সমিতি ইত্যাদি), লিট্‌ল ম্যাগাজিন ও ব্যক্তিদের কাছ থেকে। উচ্ছেদ হওয়া বস্তিবাসীদের প্রতিরোধের ওপর বড়ো ধরনের পুলিশি অত্যাচার নেমে এসেছে। ৮ এপ্রিল ৬৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে পুলিশ ৬২ জনকে ছেড়ে দিয়ে ৭ জনকে আটক করে রাখে। এর পরে নোনাডাঙা উচ্ছেদকাণ্ড এবং গ্রেপ্তারির প্রতিবাদে বেশ কিছু মিছিল পুলিশ আটকে দেয়।

আমরা মনে করি, রাষ্ট্রের তরফে এই অ্যাকশন ছিল পূর্ব–পরিকল্পিত। এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে কর্পোরেট বড়ো মিডিয়ার পরিকল্পনা। মিডিয়া (আনন্দবাজার পত্রিকা, দ্য স্টেট্‌সম্যান, স্টার আনন্দ টিভি চ্যানেল ইত্যাদি) এই ৭ জনকে মাওবাদী বলে চিত্রিত করে এবং এই প্রতিরোধকে মাওবাদী কার্যকলাপ বলে প্রোপাগান্ডা করে, যাতে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ এই আন্দোলন থেকে দূরে থাকে। কর্পোরেট আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জনপ্রতিরোধকে মাওবাদী কার্যকলাপ বলে তকমা লাগানো ভারতের কর্পোরেট–বান্ধব সরকারগুলির বেশ পুরোনো কৌশল। অথচ সরকার এবং মিডিয়া ভালোভাবেই জানে, এঁদের অনেকেরই রাজনৈতিক অবস্থান বামপন্থী হলেও তাঁরা মাওবাদী দলের সদস্য বা সমর্থক নন।

১৮ এপ্রিল ২০১২ এই ৭ জনের একজন, পার্থসারথী রায়কে আলিপুরের জেলা আদালত জামিনে মুক্তি দেয়। সরকারি উকিল কোর্টে দাঁড়িয়ে বলেন, পার্থসারথী রায়ের জামিনে তাঁদের আপত্তি নেই। বাকি ৬ জনকে আটক রাখা হয়। আমরা মনে করি, রাষ্ট্র তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে এই পদক্ষেপও অবশ্যই সুচিন্তিত ও পরিকল্পিত। এই পদক্ষেপ জাতীয় স্তরের বড়ো কর্পোরেট মিডিয়ার সঙ্গে একসুরেই শোনা গেছে। তারা অন্য বন্দিদের থেকে আলাদা করে, এমনকী কখনো কখনো উচ্ছেদের পুরো বিষয় থেকে বিচ্ছিন্নভাবে 'বিশিষ্ট বিজ্ঞানী' পার্থসারথী রায়ের গ্রেপ্তারি নিয়ে হইচই জুড়ে দিয়েছে। কখনো কখনো পার্থসারথী রায়ের গ্রেপ্তারি এবং আর এক অধ্যাপকের অন্য একটি বিষয়কে একসঙ্গেই মিডিয়া উচ্চারণ করছে। এর মধ্য দিয়ে তারা সরকারের অগণতান্ত্রিক মনোভাবকে বিষয় করে তুলতে চেয়েছে এবং নোনাডাঙার উচ্ছেদকাণ্ডকে চাপা দিতে চেয়েছে।

... *পরবর্তী অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

যদি ভালোবাসো পৃথিবীকে

আমাদের এই পৃথিবী নামক গ্রহটির পরিবেশগত বিপদগুলি নিয়ে এবং তাকে মোকাবিলা করার পদক্ষেপগুলি নিয়ে ১৯৯২ সালে হেলেন ক্যালডিকট ***If you love this planet : A plan to save the earth*** *বইটি লেখেন। ২০০৯ সালে সেই বইয়ের সম্পূর্ণ সংশোধিত ও হালনাগাদ সংস্করণে তিনি যে ভূমিকা লেখেন, সেটি এখানে বাংলায় তর্জমা করে প্রকাশ করা হল। অনুবাদক : জিতেন নন্দী।*

আমি প্রথম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসি ১৯৬৬ সালে। তখন আমি এক রক্ষণশীল তরুণী মা, আমার তিনটে বাচ্চা। সবে আমি একটা নতুন মেডিকাল ডিগ্রি পেয়েছি। হার্ভার্ড মেডিকাল স্কুলের শিশু চিকিৎসা বিভাগে সিস্টিক ফাইব্রোসিস ক্লিনিকে আমি একটা চাকরি নিলাম। নিজের বাচ্চাদের দেখতে হত, তাই আমি পার্ট-টাইম কাজ করতাম। ছোটোবেলায় অস্ট্রেলিয়াতে আমেরিকান ফিল্ম আর টেলিভিশন দেখে বড়ো হয়েছি। সবসময় মনে হত যেন কোনো দুর্বৃত্ত প্রতিটি ল্যাম্পপোস্টের আড়ালে ওত পেতে রয়েছে; ভাবতাম আমেরিকার সমস্ত রাস্তাতেই বুঝি নিওন লাইট আর ফাস্ট ফুডের দোকানের ছড়াছড়ি। তার বদলে পেলাম নিউ ইংল্যান্ডের সাজানো গোছানো সুন্দর গ্রামগুলো। সেগুলো যেমন শান্ত আর সংরক্ষিত, তেমনই সেখানকার ডাউন ইস্ট আর বোস্টনের লোকেদের গভীর যত্নশীল ব্যবহার।

১৯৬৬-৬৯ ক'টা বছর ছিল রাজনৈতিক ডামাডোল আর হিংসাত্মক ঘটনায় পরিপূর্ণ। আমি দেখলাম ভিয়েতনামের যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলন, রেডিওতে শুনলাম প্রতিবাদের গান, টেলিভিশনে দেখতে পেলাম ফুলের মতো ছেলেমেয়েদের। ১৯৬৯ সালে ম্যাসাচুসেট্স ইন্সটিট্যুট অব টেকনোলজিতে যুদ্ধবিরোধী স্থগিতাদেশের দিন জর্জ ওয়াল্ড এক অবিশ্বাস্য শক্তিশালী বক্তৃতা দেন। সেই বক্তৃতা শুনে আমি এতখানি নাড়া খেয়েছিলাম, বাড়িতে ফিরে নিভৃতে কেঁদেছিলাম।

১৯৬৮-র মার্চের এক রাতে রেডিওতে আমি শুনতে পেলাম লুইস লিওঁ দুর্দান্ত ক্রোধে ফুঁসতে ফুঁসতে মার্টিন লুথার কিং-জুনিয়রের হত্যাকাণ্ড বর্ণনা করলেন। তিনি আমাদের সকলকে রাস্তায় নেমে এই অবিচারের প্রতিবাদ করতে বললেন। মাত্র কয়েক মাস পরে গ্রীষ্মের এক গুমোট সকালে টেলিভিশন খুলে আমি দেখতে পেলাম ববি কেনেডি লস এঞ্জেল্সের এক হোটেলের মেঝেয় লুটিয়ে পড়ে রয়েছেন, তাঁর মাথা থেকে রক্ত ঝরছে। আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এল এক তীক্ষ্ণ আর্তনাদ, 'আর নয়'! কয়েকদিন পর আমি গাড়ি চালিয়ে বার্কশায়ারে গিয়ে সেন্ট প্যাট্রিক ক্যাথিড্রাল থেকে কেনেডির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বেতার ঘোষণা শুনতে পেলাম। হান্ডেল-এর 'মেসিয়াহ্' থেকে 'হালেলুজাহ্ কোরাস' গাইছিল সন্ন্যাসিনীরা, আমি কেঁদে ফেললাম।

সে-বছর শরৎকালে এক মহা আতঙ্কের মধ্যে আমি দেখলাম রিচার্ড নিক্সন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন। উত্তরোত্তর মরীয়াভাব থেকে আমি তাঁকে ঠান্ডা যুদ্ধ আর অ্যান্টি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র (অ্যান্টি ব্যালিস্টিক মিসাইল বা এবিএম) চুক্তি নিয়ে লিখলাম। আমি নিশ্চিত যে তিনি তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতায় আমার চিঠির কিছু অংশ উল্লেখ করেছিলেন। এমনকী সেনেটর এডওয়ার্ড কেনেডির কাছেও পরমাণু যুদ্ধ আর আসন্ন এবিএম চুক্তির গুরুত্ব সম্পর্কে আমি লিখেছিলাম। তিনি যথেষ্ট ভেবেচিন্তে একটা জবাব দিলেন। এতে আমার মতো এক সাদাসিধে নবীন চিকিৎসক ভিতর থেকে উত্তেজিত হয়ে উঠল।

আমার কাছে সময়টা ছিল উত্তেজনাময়। আমূল পরিবর্তনের রাজনীতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমি অনুভব করলাম যে গণতন্ত্র এক কার্যকর ভাবনা। কারণ রাজনৈতিক ডামাডোল যেন এক পরিবর্তনের স্ফুলিঙ্গ হয়ে দেখা দিল। আমি ভাবলাম, যে কোনো কিছুই করে ফেলা সম্ভব।

১৯৬৯ সালে আমি অস্ট্রেলিয়ায় ফিরে এলাম। দু'বছর বাদে আমি সফলভাবে ফরাসি সরকারের ওপর চড়াও হলাম। তারা সেই সময় প্রশান্ত মহাসাগরের এক দূরবর্তী দ্বীপে বায়ুমণ্ডলে পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা করছিল। ফরাসি পরীক্ষা 'পার্শিয়াল টেস্ট ব্যান ট্রিটি' ভঙ্গ করল। তার তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে পড়ল দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ায় অবস্থিত আমার ছোট্ট শহর অ্যাডিলেডে। মায়েদের দুধে স্ট্রনশিয়াম-৯০ এবং তেজস্ক্রিয় আয়োডিনের উপস্থিতির স্বাস্থ্যগত বিপদ নিয়ে টানা ন'মাস জনশিক্ষা প্রচারাভিযান চালিয়ে যাওয়ার পর আমার অস্ট্রেলীয় সহনাগরিকদের ৭০ শতাংশ উঠে দাঁড়াল। তারা দাবি করল, আমাদের সরকার ওই পরীক্ষা বন্ধ করার জন্য উদ্যোগ নিক। সরকার তা মেনে নিল। সরকারি উদ্যোগ গ্রহণের ফলে ফরাসিরা পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা মাটির নিচে করতে বাধ্য হল। আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক সমাজকর্মীতে রূপান্তরিত হলাম। এরপর আমার জীবন আর কখনই পুরোনো দিনগুলিতে ফিরে যায়নি।

উত্তেজনা, পরিবর্তন আর নানা সুযোগের দেশ হিসেবে আমেরিকাকে আমি গভীরভাবে শ্রদ্ধা করি। এ এক দেশ যেখানে পৃথিবীর ভাগ্য নির্ধারিত হবে। কেন আমি এমন অদ্ভুত মন্তব্য করছি? কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হল বিশ্বের সবচেয়ে ধনী এবং সামরিক ক্ষমতায় বলীয়ান দেশ; কারণ এদেশের শক্তিশালী সংবাদমাধ্যম বিশ্বের প্রতিটি কোণে প্রবেশ করেছে এবং এদেশ এমন সব মডেল প্রতিষ্ঠা করেছে যা বেশিরভাগ মানুষ করায়ত্ত করতে চায়। বলিহারি এর প্রভাব! কোটি কোটি চীনা, আফ্রিকান, ভারতীয় আর লাতিন আমেরিকানের অন্তরের কামনা আজ গাড়ি, ফ্রিজ, কোকের গেলাসে আইস কিউব আর রঙচঙে মোড়ক।

যেহেতু আমেরিকার জনসংখ্যা হল পৃথিবীর মাত্র ৪% এবং তার শক্তি-ব্যবহার ২৩%, এই জীবনযাপন কিন্তু অপর শতকোটি মানুষের উপযুক্ত মডেল হতে পারে না। এই অসংযমী জীবনযাত্রাই হল ওজোন হ্রাস, বিশ্ব উষ্ণায়ন, বাতাস-জল-মাটির বিষময় দূষণ এবং পরমাণু সম্প্রসারণের প্রধান কারণ। প্রত্যেক আমেরিকান যে কোনো তৃতীয় বিশ্বের মানুষের তুলনায় কুড়ি থেকে একশো গুণ বেশি দূষণ ঘটায়। আমেরিকার ধনী শিশুরা বাংলাদেশ বা পাকিস্তানের শিশুদের তুলনায় এক হাজার গুণ বেশি দূষণ ঘটাবে। সম্পদশালী পশ্চিমি উন্নত দেশগুলির অধিকাংশ নাগরিকদের মতোই কানাডার নাগরিকেরা তাদের দক্ষিণী প্রতিবেশীদের অমিতব্যয়ী জীবনযাত্রাকে অনুকরণ করে। বহু উন্নয়নশীল দেশও, এমনকী ভেঙে পড়া সোভিয়েত

ইউনিয়ন, ভারত ও চীন উৎসাহের সঙ্গে পুঁজিবাদের এই 'মজা'য় জড়িয়ে পড়ছে। কারণ তাদের দেশের মানুষ এই প্রাচুর্যের জীবনযাত্রাকে চাইছে। কিন্তু ৬.৭২ বিলিয়ন (= ৬৭২ কোটি) মানুষ সম্ভবত ৩০ কোটি আমেরিকানের জীবনযাত্রার সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারে না এবং আশা করতে পারে না যে তার পরেও পৃথিবী নামক গ্রহটা টিকে থাকবে। উপরন্তু, আগামী শতাব্দীর মধ্যে পৃথিবীর জনসংখ্যা ১৪০০ কোটি হয়ে উঠতে পারে।

কয়েকজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী অনুমান করছেন, যদি আমরা পৃথিবীর দূষণ, প্রজাতিগুলির বিলোপ, অতিজনসংখ্যা এবং আগামী পরমাণু শক্তির বিপদের পুঞ্জিভূত ফলাফলকে বিপরীতমুখী করার উদ্যোগ এখনই না নিই — সম্ভবত আমরা আর দশ বছরও সময় পাব না — এই গ্রহের বেশিরভাগ প্রজাতি, এমনকী হয়তো হোমো স্যাপিয়েন্সেরও, দীর্ঘস্থায়ীভাবে বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠবে।

আমার পেশা হল মানুষকে সুস্থ করে তোলা এবং একজন চিকিৎসক হিসেবে আমি মরণাপন্ন এই গ্রহকে একজন মরণাপন্ন রোগীর মতোই পরীক্ষা করি। মানবদেহের মতোই পৃথিবীর নিজস্ব দেহের এক প্রাকৃতিক পরস্পর সংযুক্ত আভ্যন্তরীণ সাম্য রক্ষার বন্দোবস্ত রয়েছে। যদি একটা ব্যবস্থা, যেমন ওজোন স্তর, অসুস্থ হয়ে পড়ে, তখন অন্য ব্যবস্থাগুলির ক্রিয়াকলাপেও অস্বাভাবিকত্ব দেখা দেয় —শস্য শুকিয়ে যাবে, সমুদ্র ও নদীর জলে ভাসমান প্রাণী ও উদ্ভিদসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং গ্রহের সমস্ত প্রাণীর চোখের অসুখ হবে এবং তাদের দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়বে।

নানান অসুখের প্রক্রিয়ায় যন্ত্রণাবিদ্ধ আমাদের বাসস্থান এই গ্রহ। সেই অসুখগুলিকে পরীক্ষা করে দেখার মতো অনমনীয়তা আর সাহস আমাদের অবশ্যই থাকা দরকার। কিন্তু নিখুঁত আর অতি সতর্ক বিশ্লেষণই যথেষ্ট নয়। আমরা শুধু রোগীদের রোগ ঘোষণা করে দিয়েই তাদের সুস্থ করে তুলতে পারি না। শুধু বলে দিলেই হয় না যে তোমরা মেনিন্‌জোককাল মেনিনজাইটিস অথবা খাদ্যনালীর ক্যানসারে ভুগছ। যতক্ষণ না আমরা সেই অসুখের প্রক্রিয়াগত কারণ বা নিদানতত্ত্বের দিকে মনোযোগ দিতে প্রস্তুত, রোগীকে সুস্থ করা যাবে না। যখন আমরা সেই নিদানতত্ত্বকে স্পষ্ট করতে পারি, তখন আমরা যথাযথ চিকিৎসার সুপারিশ করতে পারি।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে, আমাদের গ্রহ বহু বিচিত্র অসুখে জর্জরিত। সূক্ষ্ম খুঁটিনাটিতে পরীক্ষা করলে দেখা যায়, সেগুলির নিদানতত্ত্ব জটিল এবং সেগুলির মোকাবিলা করাও কঠিন। গোড়াতে পুঁজিবাদ এবং কর্পোরেট মুক্ত বাণিজ্যের চমৎকার যেসব প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদ ও তার উৎসগুলির যত্নশীল ও দায়িত্বপূর্ণ পরিচালনের দিকে সেগুলি সবসময় যায়নি। কম্যুনিজমের অশুভ ফলাফলগুলিও বহু ক্ষেত্রে বিপর্যয়কারী দূষণ এবং প্রকৃতির উচ্ছৃঙ্খল অবহেলার দিকে গেছে। ...

নাপা ভ্যালিতে একটি কলেজের ছাত্ররা সম্প্রতি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আপনি আমেরিকানদের সম্পর্কে কী মনে করেন?' প্রকাশ্যে এরকম প্রশ্নের মুখে আমি কখনো পড়িনি। তাই আমি একটা সৎ ও দায়িত্বপূর্ণ উত্তর খুঁজতে লাগলাম। আমি বলেছিলাম, আমেরিকানরা পৃথিবীর সবচেয়ে সহৃদয় এবং যত্নবান মানুষ। তারা মরীয়াভাবে সঠিক কাজটা করতে চায়। কিন্তু তারা জানেই না সঠিকটা কী। সঠিক কাজ কি পারস্য উপসাগরে যুদ্ধ করা, জর্জ বুশকে সমর্থন করা আর নিজেদের দেশপ্রেমিক হিসেবে মনে করা? অথবা সেটা কি গৃহহীনদের প্রতি যত্নবান হওয়া এবং দেশের ভিতরকার বর্ণবিদ্বেষ ও অর্থনৈতিক অসাম্যকে মোকাবিলা করা? অথবা এই গ্রহকে বাঁচানো?

এইসব প্রশ্নের কোনো সহজ উত্তর নেই। কিন্তু সেগুলিকে আমি খোঁজার চেষ্টা করেছি। আমাদের নিজের সমাজকে বিচারের দৃষ্টিতে দেখার ক্ষেত্রে ভয় পেলে চলবে না। কারণ আমরা এক যত্নশীল ও কঠোর বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে আমাদের মরণাপন্ন পৃথিবীকে সুস্থ করে তুলতে চাই।

যদি তুমি তোমার দেশের অসুখগুলি সারিয়ে তোলার জন্য তাকে যথেষ্ট ভালোবাসো, তুমি এই গ্রহকে ভালোবাসতে পারবে, তাকেও সারিয়ে তুলতে পারবে। ...

খবর দিন **খবর নিন**

খবরের কাগজ সংবাদমন্থন

সারা বছরের জন্য চল্লিশ টাকা ডাকযোগে পাঠিয়ে পাক্ষিক এই সংবাদপত্র সংগ্রহ করুন।

যোগাযোগ

জিতেন নন্দী, বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর, বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮, দূরভাষ : ২৪৯১৩৬৬৬, ই-মেল : manthansamayiki@gmail.com

এই একটাই পৃথিবী আমাদের

সৌরীন ভট্টাচার্য

এখনো পর্যন্ত যতদূর জানা আছে এই ব্রহ্মাণ্ডে আমরা একলা। আমাদের বাড়ি ঘরদোর বলতেও আর কিছু নেই। এই একটাই বাড়ি আমাদের। চাঁদের বাড়ির কথা মাঝে মাঝে একটু–আধটু শোনা যায় বটে, তবে অদূর ভবিষ্যতে তার কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। আর সেখানে ঘরবাড়ি হলেও বা কতদূর কী এগোবে। চাঁদ তো আমাদের এই পৃথিবীর সঙ্গেই গাঁটছড়ায় বাঁধা। এই বাঁধনটাই বা কতটা জোরালো তা কে জানে। আর যাই হোক চাঁদ তো পৃথিবীর চেয়ে অনেক ছোটো। তা পৃথিবীটাকেই যদি আমরা নষ্ট করে ফেলতে পারি, তাহলে চাঁদ নষ্ট করতেই বা আর কত দিন লাগবে। তবে হ্যাঁ, কয়েকটা দিন আরো সময় পাওয়া যাবে তো বটেই।

পৃথিবীতে আমরা একলা। আমরা মানে সবাই। এই আমরা, যারা আমাদের মতো, যাদের বলা হয় মানুষ, যারা আমাদের মতো নয়, যেমন পশুপাখি, গাছপালা, এমনকী পাহাড় নদী সমুদ্র পর্বত, এর সবাই ওই আমাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। আমরা যারা একসঙ্গে আছি, থাকি। যতদূর জানা আছে ব্রহ্মাণ্ডে এই সব নিয়েই আমি একলা। ব্রহ্মাণ্ডের আর কোথাও তালগাছ এক পায়ে সব গাছ ছাড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকে না, আর কোথাও লাল ঠোঁট টিয়াপাখি বট ফলে কিংবা পাকা পেয়ারায় ঠোকর দেয় না। এখনো পর্যন্ত সন্ধানে আর কোথাও প্রাণের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। না জীবজন্তু, না গাছপালা। এমনকী জড় পদার্থেও ঠিক আমাদের সঙ্গে আর কারো মিল হবার নয়। সূর্যের তাপ ও হাওয়া ও জড় স্তরের অন্যান্য শর্ত যা আমাদের এখানে প্রাণের অস্তিত্ব ও তার বিকাশের সঙ্গে যতটা সংগতিপূর্ণ তা তেমনভাবে এই ব্রহ্মাণ্ডের আর কোথাও এখনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। প্রাণের মতো এত বড়ো একটা দুর্লভ ব্যাপার নিয়ে আমরা তেমন সচেতন থাকি কই। অথচ এই যা কিছু সব নিয়ে এই পৃথিবীতে আমরা বাঁচি, বাঁচার তাগিদেই তার সব কিছুর সঙ্গে আমাদের সবার যোগ রয়েছে সে কথাটা আমরা তেমন করে খেয়াল করি না। করি না বলে আমাদের আচরণে দেখা দেয় অসংযম ও অবিমৃশ্যকারিতা। তা ছাড়া মানুষকে নিয়ে আরও একটা বড়ো বিপদ আছে। কীভাবে যেন মানুষের ধারণা হয়েছে এই সব কিছুর মধ্যে মানুষই শ্রেষ্ঠ প্রাণী। মানুষই নাকি সবচেয়ে বুদ্ধিমান। তাই সবার সঙ্গে, সব কিছুর সঙ্গে মিলেমিশে থাকার বদলে মানুষ নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহিরের পথে গেল। ফলে সে সব কিছুকে নিজের কাজে লাগাতে গেল। পৃথিবী, ভূপ্রকৃতি, নিসর্গ, এদের প্রত্যেকের দিকে মানুষ তাকালো প্রয়োজনের দৃষ্টিতে,ব্যবহারিক দৃষ্টিতে, লোভের দৃষ্টিতে, এবং শেষ পর্যন্ত নিতান্ত লাভের দৃষ্টিতে।

পৃথিবী আমাদের একটাই। আর সেখানে সবাইয়ের সঙ্গে মিলিতভাবে আমরা একলা। এমনিভাবে এই পৃথিবীতে চড়ে আমাদের ব্রহ্মাণ্ড যাত্রা। কল্পনাটা একেবারে জাহাজের জলযাত্রার মতো। এই একটি জাহাজে আমরা চলেছি সবাই। এই জাহাজটাই আমাদের বসুন্ধরা, সেই আমাদের শ্যামল বসুমতী। এই সব শব্দের মধ্যে আছে সমৃদ্ধির কথা, শ্রীর কথা, শুধু সঞ্চয়ের কথা নয়, শুধু বিত্তের কথা নয়। শুধু বিত্তবান হওয়া নয়, শ্রীময় হতে শেখা। এই জায়গাটায় মানুষ তার আচারে আচরণে বোধহয় কিছু গোলমাল করে ফেলেছে। তাই তার শ্রী নষ্ট হয়েছে, নষ্ট হয়েছে আমাদের এই জাহাজের ভারসাম্য। তবে সম্ভবত ওই বোধ বুদ্ধি ও চৈতন্যের জোরেই মানুষ বুঝতে পেরেছে ভারসাম্যের অভাবে তার বিপদের কথা। তাই সে আলাদাভাবে ভাবতে চেয়েছে বসুন্ধরার কথা। আমাদের আবহাওয়া মণ্ডল, ভূপৃষ্ঠের ওপর প্রবাহিত বায়ুস্রোত, আমাদের জীবমণ্ডল, সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা, মহাসাগরের লবণাক্ততা ইত্যাদি সব জড়িয়ে আমাদের জীবনবৃত্তান্ত। পারস্পরিক নির্ভরতা কতটা সুদূরপ্রসারী তার পুরোটা আমাদের হয়তো এখনো জানা হয়নি। কিন্তু নানাদিকে আমাদের নজর দিতে হচ্ছে। আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ যে অফুরান নয় সে বোধ ধাক্কা দিয়েছে আমাদের চৈতন্যে। বিশ্বের তাপমাত্রার মাত্রা ছাড়া বৃদ্ধিতে আমাদের যে–বিপদ তা নিয়ে আজ আমাদের সজাগ হতে হয়েছে। ওজোন স্তরের ফুটোফাটা আজ বড়ো বিপদের মতো হাজির আমাদের সামনে। আমাদের সামগ্রিক কার্বন নিঃসরণ আজ সকলের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব প্রসঙ্গ আজ আন্তর্জাতিক সম্মেলন মহাসম্মেলনের বিষয়। ওই স্তরে পৌঁছে গেলে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব অনিবার্য। সেই ফাঁদে পড়ে এই পৃথিবীর অস্তিত্বই আজ বিপন্ন। তবু একটা অন্য মনের প্রসার সম্ভাবনার কথা ভেবে আমরা পালন করি বসুন্ধরা দিবস, বসুন্ধরা সপ্তাহ বা বসুন্ধরা প্রহর। এপ্রিল মাসের ২ তারিখে পালিত হল বসুন্ধরা প্রহর। সকলের কাছে অনুরোধ ছিল সন্ধ্যাবেলায় একটা নির্দিষ্ট সময়ে এক ঘন্টা আলো নিভিয়ে রাখা। এই স্বেচ্ছা নিষ্প্রদীপ অবস্থা বরণ করে নেওয়ার তাৎপর্য নিশ্চয়ই প্রতীকী। শক্তি ব্যবহারে সংযম দেখানো। এই প্রতীকী আচরণেরও কিছু মূল্য আছে বই কি। এই এপ্রিলের ১৬ থেকে ২২ তারিখ পর্যন্ত পালিত হবে বসুন্ধরা সপ্তাহ, তার শেষ দিনটা (২২ এপ্রিল) চিহ্নিত হয়েছে বসুন্ধরা দিবস হিসেবে।

এই প্রসঙ্গে ধারণাগত দু–একটা কথা খেয়াল করা যাক। এই যে পৃথিবী নামে আমাদের এক শূন্যে ভাসমান জাহাজ, এর আবর্তন, পরিক্রমণ, সঞ্চরণ সমেত এ এক নানা তন্ত্রের চলমান সমাহার। মানুষ সমেত সমস্ত জীবমণ্ডল, জৈব–অজৈব নানা তন্ত্র, ভূপৃষ্ঠের জলতন্ত্র, আবহাওয়া মণ্ডল, বায়ুস্রোত ইত্যাদি নিয়ে আমাদের এই গ্রহ আহ্নিক গতিতে আবর্তিত হচ্ছে, বার্ষিক গতিতে সে সূর্যকে পরিক্রমণ করে আর এই সমস্ত প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সে এগিয়ে চলেছে সম্ভবত ব্রহ্মাণ্ডের প্রসারের পথে। আর সেই স্তরে কোনো এক রকমের সম্পর্কে আমাদের পৃথিবী নিশ্চয়ই জড়িয়ে যাচ্ছে অন্যান্য বস্তুপুঞ্জের সঙ্গে। এই যে পারস্পরিক সম্পর্কে জড়িয়ে থাকা একাধিক তন্ত্র, এই নিয়ে যে সমগ্রতার বোধ, আমাদের বসুন্ধরা ভাবনায় সেই বোধের পরিচয় ক্রমে ফুটে উঠছে নানা ভাবে। গাইয়া তত্ত্ব এই সমগ্রতা বোধের এক বড়ো পরিচয়।

গাইয়া তত্ত্বের প্রবর্তক জেম্‌স্ লাভলক্ নামের এক রসায়নবিদ্। গত শতাব্দীর ষাট–সত্তর দশক জুড়ে এই তত্ত্ব প্রচারিত ও বিকশিত হয়। জেম্‌স্ লাভলকের মূল ধারণা অণুজীববিজ্ঞানী লীন মারগুলিস–এর হাতে আরও বিস্তার লাভ করে। তত্ত্বটির নামকরণে সহায়তা করেন ইংরেজ লেখক উইলিয়াম গোল্‌ডিং। লাভলকের ধারণা শুনে গোল্‌ডিং তাঁকে পরামর্শ দেন গ্রিক পুরাণের ধরিত্রী দেবী গাইয়া

(Gaia)–র নামে এই তত্ত্বের নামকরণ করতে। শব্দটি একটু–আধটু অন্য বানানেও পাওয়া যায়। জিয়োফিজিক্স, জিয়োগ্রাফি, জিয়োলজি ইত্যাদি শব্দের জিয়ো (geo) এই ধরিত্রী দেবীর দ্যোতক। গাইয়া তত্ত্বকে অনেক সময় গাইয়া হাইপোথিসিস বলেও বলা হয়। এই হাইপোথিসিসের যা বক্তব্য তা বৈজ্ঞানিক বিচারে পুরোপুরি তত্ত্বের সমতুল্য কিনা তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে দ্বিধা সংশয় আছে। গাইয়া–কল্পনায় বলা হয় যে পৃথিবীর সমস্ত জৈব সত্তা তাদের পরিমণ্ডলের সমস্ত অজৈব বস্তুর সঙ্গে মিলে এক সংহত পরস্পর অন্বিত ও স্বনিয়ন্ত্রিত একটি জটিল তন্ত্র হিসেবে বিদ্যমান। তন্ত্রটির আচার আচরণ অনুধাবন করতে হবে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে। এই স্বনিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়ার পরিণতি হিসেবেই আমাদের এই গ্রহের ওপর প্রাণের শর্ত বজায় থাকে। পৃথিবীতে অন্য যত রকমের তন্ত্র ক্রিয়াশীল তারা সকলেই এই সার্বিক বৃহৎ তন্ত্রের অণুতন্ত্র। এই সমস্ত তন্ত্র মিলিয়ে যে পরস্পর নির্ভরতা এবং তাদের মধ্যেকার যে অন্তর্লীন ভারসাম্য তার ওপরে দৃষ্টি আকর্ষণ করাই গাইয়া তত্ত্বের লক্ষ্য। এই পৃথিবীর তন্ত্রসমূহ মিলিতভাবে যে ভারসাম্যে স্থিত থাকে তাকে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় বলা হয় হোমিওস্ট্যাসিস। এই হোমিওস্ট্যাসিস অবস্থার ভারসাম্য কোনো কারণে নষ্ট হলে তা জীবতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক। তন্ত্রসমূহের পরস্পর নির্ভরতার ক্ষেত্রেও তখন নানারকম সাম্যচ্যুত আচরণ লক্ষ্য করা যেতে পারে। এই যে আজ বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ে এত কথা, এত আলাপ আলোচনা, এত আন্তর্জাতিক সম্মেলন ওই সাম্যাবস্থার বিঘ্ন সম্ভাবনা তার কারণ। আমাদের মহাসাগরের লবণাক্ততার পরিমাণ, বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন, এক দীর্ঘ সময় ধরে ৩.৪ শতাংশে মোটামুটি স্থির হয়ে আছে। এই পরিমাণ যদি কোনোদিন লক্ষণীয় ভাবে বদলাতে থাকে তাহলে সেটা হবে ওই হোমিওস্ট্যাসিস–এর বিচ্যুতি।

মোটামুটি এই আমাদের গাইয়া তত্ত্ব। ২০০১ সালে ইউরোপীয় ভূপদার্থবিদ্যা সংস্থার এক হাজার বিজ্ঞানী আমস্টারডাম সম্মেলন থেকে এক যৌথ বিবৃতি প্রচার করেন। এই আমস্টারডাম ঘোষণার শুরুতেই বলা হয়েছিল — "The Earth system behaves as a single, self-regulating system with physical, chemical, biological, and human components." ধরিত্রী তন্ত্রের এই যে একক মিলিত পরস্পরনির্ভরশীল স্বনিয়ন্ত্রিত চরিত্র, এটাই হতে পারে বসুন্ধরা সপ্তাহে, বসুন্ধরা দিবসে আমাদের ধ্যানের বার্তা। বিচ্ছিন্নতার বদলে এক নিবিড় লগ্নতা, এই হোক আমাদের বসুন্ধরা দৃষ্টি।

বিপন্ন বিশ্বপ্রকৃতি

সুজয় বসু

মানুষ ক্রমেই লোভী হয়ে পড়ছে। অল্পে সন্তুষ্ট হওয়ার যে শিক্ষা মনীষীরা দিয়ে এসেছেন, এখন তা ভুলে গিয়ে মানুষ ভোগেই বেশি আসক্ত হচ্ছে। জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে। জীবনধারণের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তার চাহিদা স্বাভাবিক ভাবেই বাড়ছে। নিত্য নতুন ভোগের উপকরণ বাড়ছে। আগে যেটুকু হলে চলে যেত, এখন আর তাতে চলে না। বিভিন্ন রকম ভোগের সামগ্রীর বিজ্ঞাপনে ব্যবসায়ীরা কৃত্রিম চাহিদাকে উৎসাহিত করে তাদের লাভের অঙ্ককে বাড়িয়ে চলেছে। ধরিত্রী মায়ের উৎপাদন ক্ষমতা যে সীমিত, এই সহজ সত্যটা অস্বীকার করে উদ্দাম ভোগের যে পর্ব চলছে তাতে ভাবী প্রজন্ম যে নিশ্চিতই কঠিন সমস্যায় পড়বে এবং সে সম্পর্কে উদাসীন থাকাটা যে অনৈতিক তা কেউই মনে রাখছেন না বা রাখতে পারছেন না। তাতে সমস্যাটা এখন এমন পর্যায়ে এসেছে যে আশু প্রতিকারের ব্যবস্থা নেওয়াটা অত্যন্ত জরুরি হয়ে উঠেছে।

এই পৃথিবীর উদ্ভিদজগৎ প্রাণীজগৎ থেকেই মানুষ তার জীবনের মূল উপকরণ সংগ্রহ করে। প্রকৃতি উদারভাবেই এতদিন সব কিছু জুগিয়ে এসেছে। ইদানীং সেই জোগানে টান ধরছে। মানুষের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পৃথিবীর মোট উৎপাদন ক্ষমতাকে ছাপিয়ে গেছে। বিজ্ঞানীরা এ সম্পর্কে যাবতীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করে দেখছেন যে এখন এই সামগ্রিক চাহিদা মেটাতে একটি পৃথিবীই যথেষ্ট নয় — উৎপাদন আরও ৩০ শতাংশ বাড়ানো দরকার। আর দু'চার দশকের মধ্যেই, যদি মানুষ তার ভোগলিপ্সা না কমায়, চাহিদা মেটাতে দুটি পৃথিবীর দরকার হবে। কী করে তা সম্ভব হবে? মানবসমাজ দু'ভাগে বিভক্ত হবে — এক অংশের চাহিদা মিটবে, অপর অংশের মিটবে না। পৃথিবীর জনসংখ্যার এক বৃহৎ অংশের জীবনধারণের উপযোগী ন্যূনতম প্রয়োজন মিটবে না — অর্ধাহারে অনাহারেই তাদের জীবন কাটাতে হবে। এই অমানবিক পরিস্থিতি নিশ্চয়ই আজকের তথাকথিত সভ্য সমাজের কাম্য নয়।

এই সঙ্গীন অবস্থা বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, আরও গভীর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মানুষ তার ভোগের উচ্ছ্বাসে প্রকৃতিতে অবাঞ্ছিত পরিবর্তন আনছে। শক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সেটা সবচেয়ে প্রকট হয়ে দেখা দিচ্ছে। জীবাশ্ম জ্বালানির অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ এতটা বেড়েছে যে পৃথিবী ক্রমেই উষ্ণ হচ্ছে। এই উষ্ণায়নের ফলশ্রুতিতে জল–বায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ আরও প্রবল হবে বলেই বিজ্ঞানীদের অনুমান। মেরু অঞ্চলের বরফ গলে গিয়ে সমুদ্রের জলতলকে ওপরে তুলবে। নিচু দ্বীপগুলি সমুদ্রে তলিয়ে যাবে, নিচু তটভূমি প্লাবিত হবে। অসংখ্য মানুষ গৃহহীন ভূমিহীন হবে। আরও আশংকা, দুনিয়া জুড়েই খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত হবে। এমন সংকট মানুষের দীর্ঘ ইতিহাসে ইতিপূর্বে দেখা যায়নি।

বর্তমানের এই গম্ভীর পরিস্থিতি যে মানুষেরই তৈরি এ সম্পর্কে দ্বিমত নেই। গত শতাব্দীতেই এর সূচনা। শিল্প বিপ্লব এল। শিল্পপতিরা তাদের উৎপাদনে নানা বৈচিত্র্য নিয়ে এল। ঢালাও বিজ্ঞাপনে ক্রেতাদের আকৃষ্ট না করতে পারলে আশানুরূপ মুনাফা হয় না। প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয়, এমনকী ক্ষতিকর পণ্যও, বিজ্ঞাপনের মাহাত্ম্যে অবাধে বিক্রি হতে লাগল। এটাই প্রগতি বলে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টাও অব্যাহত থাকল বিশিষ্টজনদের সমর্থনে। ভোগবাদই নতুন যুগের কৃষ্টি এবং অর্থনৈতিক উন্নতির সোপান, এই তত্ত্ব সাধারণ মানুষের কাছে বিভিন্ন মোড়কে পরিবেশন করা হল। সরল

জীবনযাপনের আদর্শকে অর্থহীন এবং বর্তমানের অনুপযোগী ছাপ দিয়ে তা বর্জন করে ভোগবাদকেই আধুনিকতার নিদর্শন বলে তুলে ধরা হল।

প্রযুক্তির উন্নয়নে উৎপাদন বাড়াতে অসুবিধা হল না। পণ্যের বাজার আরও বিস্তৃত করা দরকার। মানুষকে ভোগের জগতে টেনে আনতে হবে। ঢালাও প্রচার চলল — ভোগই জীবনের লক্ষ্য, জীবনযাত্রার সঠিক পথ। ভোগেই আত্মার সন্তুষ্টি ও সঠিক ব্যক্তিত্বের প্রকাশ, প্রতিষ্ঠিতজনেরা এ কথা জনসাধারণকে বুঝিয়ে ছাড়ল। জীবনযাত্রার ধরনে পরিবর্তন এল। বড়ো বাড়ি, গাড়ি, দামি পোশাক ও খাদ্য এবং অপচয়েই আভিজাত্য অর্জিত হয়, এই ধারণায় প্রভাবিতরাই সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠ হল।

এসবের জন্য যা কিছু উপাদান তার জন্য প্রয়োজন হল প্রাকৃতিক সম্পদের। নির্বিচারে তার ব্যবহার চলছে। ১৯৫০ থেকে ২০০৫ এই পঞ্চান্ন বৎসরে পৃথিবীতে ধাতুর উৎপাদন বেড়েছে ৬ গুণ, খনিজ তেলের উৎপাদন ৮ গুণ এবং প্রাকৃতিক গ্যাস ১৪ গুণ। সব মিলিয়ে প্রাকৃতিক খনিজ সম্পদ সংগ্রহের পরিমাণ এখন বৎসরে ৬০০০ কোটি টন, ত্রিশ বৎসর আগে যা হত তার দেড়গুণ। এই হারে উত্তোলনে খনিজ তেলের উৎপাদন চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছবে আগামী পনেরো বৎসরে। এই হিসাব আন্তর্জাতিক তৈলভূতত্ত্ববিদদের। সত্যিই এমনটা হলে এই শতাব্দীর মাঝামাঝি অর্থাৎ আগামী ৪০ বৎসরেই খনিজ তেলের আকাল দেখা দেবে, এই আশঙ্কা আদৌ ভিত্তিহীন নয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যবহার এই ভোগবাদী কৃষ্টির কল্যাণে কোথায় পৌঁছেছে তার একটা উদাহরণ — ২০০৮ সালে পৃথিবীতে গাড়ি বিক্রি হয়েছে ৭ কোটি, রেফ্রিজারেটর ৮.৫ কোটি, কম্পিউটার ৩০ কোটি এবং মোবাইল ফোন ১২০ কোটি! পৃথিবীর জনসংখ্যা তখন ছিল ৬৪০ কোটি।

আসলে এই দুর্লভ মানবজীবনের উদ্দেশ্য যে একটা সৎ সুস্থ জীবনযাপনের তা থেকে বিচ্যুত হয়ে মানুষ আজ দিশেহারা। চিরকাল অর্থকেই অনর্থের মূল বলে এসেছেন প্রাজ্ঞজনেরা। কেউ মেনেছে, কেউ মানেনি। না মেনে খুব সুখে থাকেনি সেকথা বলা যায়। ভোগবাদী কৃষ্টি এই সনাতন শিক্ষাকে বর্জন করেছে — সাম্প্রতিক কালেই এই প্রবণতা বেড়েছে, আমেরিকায় প্রথম বর্ষের কলেজছাত্রদের কাছে শিক্ষার উদ্দেশ্য কী তা জানতে চেয়ে এক সমীক্ষা করা হচ্ছে গত কয়েক দশক ধরে। ১৯৭০ সালে এক সৎ অর্থপূর্ণ জীবনের পক্ষে ছিল প্রায় ৮০ শতাংশ ছাত্রছাত্রী এবং আর্থিক স্বচ্ছলতার পক্ষে ছিল ৪০ শতাংশেরও কম। ২০০৫ সালে অবস্থাটা তার বিপরীতে দাঁড়িয়েছে, এখন ৮০ শতাংশ স্বচ্ছলতার পক্ষে এবং ৪০ শতাংশ অর্থপূর্ণ জীবনের পক্ষে। আমাদের দেশে এই জাতীয় সমীক্ষা করা হয়নি। ভোগবাদের প্রবল প্রতাপ বিশ্বময় বিস্তৃত হওয়ার কারণে এখানেও সমীক্ষার ফল যে একই রকম হবে তা ধরে নেওয়াটা অসমীচীন হবে মনে হয় না।

আশার কথা, আগের তুলনায় ভোগবাদের কুফলে প্রাকৃতিক বিপর্যয় সম্পর্কে সচেতনতা একটু একটু দেখা যাচ্ছে। অভ্যাস পরিবর্তনে যে মানসিক দৃঢ়তার প্রয়োজন তাকে শৈশব থেকে লালন করতে হয়। কাজটা কঠিন এবং সময়সাপেক্ষও বটে। কিন্তু তার প্রয়োজনের গুরুত্বটাকে লঘু করে দেখাটা ঠিক হবে না। ধীরে ধীরে জনমানসে এক স্থিতিশীল পোষণযোগ্য উন্নয়নের ধারণাকে জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এই সম্পর্কে গত শতাব্দীর শেষ দশক থেকেই আন্তর্জাতিক স্তরে রাষ্ট্রসংঘের সদস্যদের নিয়ে ধারাবাহিক আলোচনা চলছে। যদিও এই আলোচনার কেন্দ্রে বিশ্ব উষ্ণায়নের বিষয়টি রয়েছে, কিন্তু পোষণযোগ্যতার দিকটিও যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনায় এসেছে। আসলে উন্নয়নের সঠিক পথ কী হবে তা নিয়ে বিশ্বের শীর্ষ নেতৃত্ব এখনও সহমতে আসেননি। তবে এই ভোগবাদী সমাজকে ভোগ্যবস্তু সংগ্রহের প্রাকৃতিক সীমাবদ্ধতাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেই সমাধান সূত্র খুঁজতে হবে।

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশ্বপ্রকৃতিকে জানার পদ্ধতিতে বিষয়ভিত্তিক এক বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। পদার্থবিদ্যার বিশ্ব এবং জীববিদ্যার বিশ্ব পৃথকভাবেই চর্চিত হয়। অতি সম্প্রতি বিভিন্ন বাস্তব সমস্যার সমাধানের প্রয়োজনে এক সামগ্রিক দৃষ্টিতে জড়জগৎ ও জীবজগৎকে সংযুক্তভাবে জানার চেষ্টা চলছে। জীবকুলের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং একের জীবনধারণে অনেকের অবদানের কথা সঠিকভাবে বুঝবার প্রচেষ্টা গুরুত্ব পাচ্ছে। জীবনধারণ প্রক্রিয়াকে সমৃদ্ধ করে তুলতে এর মৌলিক প্রয়োজন রয়েছে।

ধরিত্রীমাতা এ পর্যন্ত তাঁর কোটি কোটি সন্তানকে সাফল্যের সঙ্গেই লালন করে এসেছেন। জীবকুলের শ্রেষ্ঠ সংস্করণ মানুষ তার চিত্তবিকৃতিতে সেই সুষ্ঠু সনাতন পদ্ধতিকে বিপন্ন করে তুলছে। এই অপরাধের চূড়ান্ত শাস্তি তো মানুষের ক্রম অবলুপ্তি। কোনোভাবেই মানুষের এই ভয়ংকর কুৎসিত পরিণতি মেনে নেওয়া যায় না।

এখনো সময় আছে। পশ্চিমি দুনিয়ার ভোগবাদের ভ্রান্ত বিকৃত আদর্শ থেকে বেরিয়ে এসে ভারতের সনাতন ত্যাগ ও সহমর্মিতার পথ ধরতে হবে। এক এবং অদ্বিতীয় এই পৃথিবীকে সুস্থ শ্যামল জীবনদায়িনীরূপে সংরক্ষণ করাই হোক সকলের পবিত্র কর্তব্য।

সর্বজীবের সর্বপ্রাণের কল্যাণ হোক।

মন্থন সাময়িকীর গ্রাহক হোন।

ডাকযোগে সারা বছরের ছ'টি সংখ্যার গ্রাহক চাঁদা পঞ্চাশ টাকা।

যোগাযোগ

জিতেন নন্দী, বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর, বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮

দূরভাষ : ০৩৩–২৪৯১৩৬৬৬, ই-মেল : manthansamayiki@gmail.com

সামগ্রিক পরিবেশ সহায়ক কৃষিই এগোনোর পথ

ভরত মানসাটা

নিখিল বিশ্ব পরিসরের এক বিশাল সমুদ্রে ভাসমান স্বকীয়তায় বিশিষ্ট এক নিঃসঙ্গ দ্বীপ আমাদের এই পৃথিবী। সে এক দুর্লভতম ক্ষমতার অধিকারী, তার নিজ গর্ভে জীবনের এক সমৃদ্ধ প্রাচুর্যকে ধারণ ও লালন করতে সে সক্ষম। এই কারণেই সারা বিশ্ব জুড়ে আমরা তাকে বলি *ধরিত্রী মাতা*, কেবল মানুষের মা নয়, সমস্ত জীব ও প্রাণী জগতের, আমাদের সকল ভাই ও বোনেদের।

পূর্বপুরুষেরা আমাদের শিখিয়েছিলেন, সমগ্র পৃথিবী একটাই পরিবার — *বসুধৈব কুটুম্বকম্*! আর *পরস্পর সহ-অস্তিত্ব* অর্থাৎ পারস্পরিক নির্ভরশীলতাই হল এর চালিকাশক্তি। বেপরোয়া ভোগবাদ, শিল্পবাদ ও সামরিকবাদের তিন বিপজ্জনক পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে টলমল এই পৃথিবী আজ আবর্জনার স্তূপে ঢাকা।

প্রকৃতি এবং তার প্রাণ-সহায়ক ব্যবস্থা — তার জল, মাটি, বাতাস, অরণ্য আর জৈববৈচিত্র্য — এসবকে বিপর্যস্ত করার জন্য আজকের শিল্পভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থাও সমান অপরাধী। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ প্রাকৃতিক চাষি ভাস্কর সাভে বলেছেন, আমরা মানুষেরা ধরিত্রী মায়ের স্বাস্থ্যকর দুধের অধিকারী বটে। কিন্তু আমরা যদি একই সঙ্গে তার মাংস আর রক্ত চাই, কীভাবে আমরা তার বেঁচে থাকা আশা করব?

- সামগ্রিক পরিবেশ সহায়ক কৃষির অর্থ হল প্রকৃতির সঙ্গে মানানসই জৈববৈচিত্র্যময় জৈবচাষ। আমাদের মাটি, জল-ভাণ্ডার ও শস্য-বৈচিত্র্যকে সংরক্ষিত ও পুনরুৎপাদিত করার মধ্য দিয়ে এই ধরনের কৃষিব্যবস্থা সামগ্রিক প্রাকৃতিক উৎপাদনশীলতাকে বাড়ায়। এতে শক্তির খরচ কম হয়। এটা কার্বনকে আলাদা করতে পারে এবং আবহাওয়ার পরিবর্তনকে মোকাবিলা করতে পারে। বাইরের পরিবেশের চাপে ভেঙে পড়ার ঝোঁককে ঠেকানোর মধ্য দিয়ে এই ব্যবস্থা জাতীয় ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতাকে বাড়ায়। পুষ্টিকর ও নির্বিষ খাদ্য পাওয়ার সামর্থ্য যাতে সকলেই ধারাবাহিকভাবে অর্জন করতে পারে, তার জন্য এটাই একমাত্র পথ।
- রাষ্ট্রসংঘ পোষিত সংস্থা 'ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট অব এগ্রিকালচার, সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ফর ডেভেলপমেন্ট', যাদের পিছনে ভারতবর্ষ সহ আরও ৬০টি দেশের সহায়তা রয়েছে, তাদের 'বিশ্ব কৃষি প্রতিবেদন'-এ সিদ্ধান্ত টানা হয়েছে 'বরাবরের মতো ব্যবসা চালিয়ে যাওয়াটা কোনো বিকল্প নয়'। FAO, WHO, UNDP, UNEP এবং বিশ্বব্যাঙ্কের প্রতিনিধি সহ সারা বিশ্বের ৪০০ জন কৃষি-বিশেষজ্ঞ এবং অন্যান্য বিষয়ের আরও ১০০০ জন বিশেষজ্ঞ মিলে এই সমীক্ষার প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছেন। এই প্রতিবেদনের সুপারিশ হল : ছোটো ছোটো আকারে যারা চাষ করে তাদের মাধ্যমে প্রাকৃতিক উৎসগুলোকে সতর্কভাবে ব্যবহার করার ওপর ভিত্তি করেই এগোতে হবে। পরিবেশ সহায়ক কৃষিব্যবস্থা গড়ে তোলার এটাই পথ। এতে বলা হয়েছে, উন্নত-জিন-ফসল (জেনেটিকালি মডিফায়েড বা জিএম) ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও আবহাওয়া পরিবর্তনের সমস্যার কোনো সমাধান করতে পারে না।
- যে প্রধান পরিবেশ-সহায়ক *পুঁজি* — মাটি, জৈববৈচিত্র্য ও মাটির তলার জল-ভাণ্ডারের ওপর কৃষি মূলগতভাবে নির্ভরশীল, তাকে ধ্বংস করেছে আধিপত্যকারী শিল্পীয় মডেল। যে জীবাশ্ম-জ্বালানি নবীকরণযোগ্য নয়, তার দাম দিন দিন বেড়েই চলেছে এবং তার ওপর কৃষির নির্ভরশীলতা খুবই বেশি। এই ধরনের কৃষি-শিল্প একেবারেই টেকসই নয়, এতে শক্তির খরচ বেশি এবং অর্থখরচও বেশি।
- আধুনিক যন্ত্রনির্ভর কৃষি, যেখানে রাসায়নিক দ্রব্য বেশি ব্যবহার হয়, সেখানে এক ক্যালরি খাদ্য তৈরি করতে ১০ ক্যালরি শক্তি খরচ হয়। রাসায়নিক সার উৎপাদন করতে প্রচুর পরিমাণ জীবাশ্ম-জ্বালানি লাগে। ট্রাক্টর সহ কৃষির অন্যান্য যন্ত্রপাতি উৎপাদন করতে এবং সেগুলো ব্যবহার করতেও তা লাগে। সার ও খাদ্যের শত-সহস্র মাইল পরিবহণে যে বিশাল পরিমাণ জীবাশ্ম-জ্বালানি খরচ হয়, তাকে এর সঙ্গে যদি যোগ করা হয়, তাহলে আধুনিক কৃষি-শিল্প ব্যবস্থার 'শক্তি-দক্ষতা' আমাদের চমৎকৃত করবে।
- ১৯৭০-৭১ থেকে ১৯৯৩-৯৪ সালের পর্যায়টাকে *সবুজ বিপ্লবের সবচেয়ে সক্রিয় পর্ব* বলা হয়। সেই সময়ের হিসেবে দেখা যাচ্ছে, রাসায়নিক সারের ব্যবহার বেড়েছে ৬১৬ শতাংশ, বিদ্যুতের ব্যবহার ৭৪২ শতাংশ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে নেওয়া ঋণের পরিমাণ বেড়েছে ১১২৮ শতাংশ। গত দশকের শেষভাগে ভারতের রাসায়নিক সারে ভর্তুকি এককভাবে বেড়ে হয়েছে ১,১৯,০০০ কোটি টাকা। শেষ দুই আর্থিক বছরে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় সারের ৪০% নাইট্রোজেন জাত সার, ৯৭% ফসফরাস সার ও ১০০% পটাশ সার বিদেশ থেকে খুব বেশি দামে আমদানি করেছি (এবং এখনও এর দাম বেড়ে চলেছে)। শিল্পকৃষির জন্য যে প্রচুর পরিমাণে জীবাশ্ম-জ্বালানি লাগে, তারও বড়ো অংশ আমদানি করা হয়েছে এবং এর অনেকটাই অস্থির উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে বিশাল খরচ করে আনা হয়েছে।
- পৃথিবীতে মোট যে পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড ছাড়া হয় তার ২৫%, যে পরিমাণ মিথেন ছাড়া হয় তার ৬০% এবং যে পরিমাণ নাইট্রোজেনের অক্সাইড ছাড়া হয় তার ৮০%-এর জন্য দায়ী বর্তমান শিল্প-কৃষি ব্যবস্থা। উল্লেখ্য, নাইট্রোজেন জাত সার যে পরিমাণ বিষাক্ত নাইট্রোজেন অক্সাইড গ্যাস ছাড়ে তা গ্রিনহাউস গ্যাস হিসেবে কার্বন ডাইঅক্সাইডের চেয়ে ২০০ গুণ বেশি বিপজ্জনক।
- ভারতের 'ন্যাশনাল কমিশন অন ফার্মার্স' (NCF) জানিয়েছে যে এদেশের ৪০% চাষি চাষের কাজ ছেড়ে দিতে চাইছে। কারণ পরিবেশের অবনতি এবং চাষের খরচ অত্যধিক বেড়ে যাওয়ায়

তারা এতই হতাশাগ্রস্ত। এর ভবিষ্যত চিত্রটি হল, পরিবেশ ও অর্থনীতির চাপে উদ্বাস্তু হয়ে ২৫ কোটি মানুষের স্রোত শহরের বস্তিগুলোকে ভাসিয়ে দেবে। যদি ধরে নেওয়া যায় যে কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ মানুষের তিনগুণ ভোগ করে একজন শহরের মানুষ, তাহলে অর্থনৈতিক বা পরিবেশের বিচারে কোনোভাবেই ধারাবাহিক নগরায়ণ সম্ভব নয়।

- ভারতের চাষিরা আমেরিকার চাষিদের চেয়ে সংখ্যায় দুশোগুণ বেশি এবং তারা রাষ্ট্রের নামমাত্র সহযোগিতা পেয়ে বা একেবারেই না-পেয়ে বেঁচে আছে। অপরপক্ষে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিতে সেখানকার জনসংখ্যার মাত্র ২% নিয়োজিত; তা বিপুল শক্তি-নির্ভর এবং তার জন্য প্রতিবছর শত শত কোটি টাকা ভর্তুকি দেওয়া হয়। (আমেরিকায় গড়ে কৃষকদের মাথা পিছু যে পরিমাণ ভর্তুকি দেওয়া হয়, তা ভারতের তুলনায় কয়েকশো গুণ বেশি।) আমেরিকার কর্পোরেট শাসিত শিল্প-কৃষির মডেল যদি এখানেও অনুসরণ করা হয়, তাহলে প্রচুর মানুষ বেকার হবে, সামাজিক অশান্তি দেখা দেবে। পাশাপাশি, পরিবেশ ধ্বংস হবে এবং অর্থনীতি দেউলিয়া হয়ে পড়বে।
- পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত যত খাদ্য উৎপাদন হয়, তা পৃথিবীর সকল মানুষকে খাইয়েও বাড়তি থেকে যাবে। কিন্তু সেখানে একশো কোটির বেশি মানুষ অনাহারে ও অপুষ্টিতে ভোগে। কারণ তারা তাদের সাধ্য মতো দামে পরিমাণ মতো খাবার কিনতে পারে না।
- *কীটনাশক ব্যবহার না করে* (নন পেস্টিসিডাল ম্যানেজমেন্ট বা এনপিএম) ফসলে পোকা লাগা আটকানোর নানারকম পদ্ধতি সফলভাবেই আয়ত্ত করা গেছে। 'বিটি শস্য' বা 'সিন্থেটিক কীটনাশক' ব্যবহার করার দরকারই পড়ে না, যদি ওই পদ্ধতিগুলো ঠিক ঠিক প্রচার পায়।
- ভারতের সবুজ বিপ্লবের *পুরোধা রাজ্য* পাঞ্জাবে ভাতিন্দা-বিকানীর এক্সপ্রেসের নাম *ক্যানসার এক্সপ্রেস*। এই ট্রেনে প্রতিদিন যারা রাজস্থানের বিকানীরে যায়, তাদের ৬০% বিকানীরের ক্যানসার চিকিৎসা কেন্দ্রে চিকিৎসা করাতে যায়। এই ক্যানসার রুগিরা ফসলে অতিমাত্রায় কীটনাশক ব্যবহারের শিকার বলেই সন্দেহ করা হয়।
- ১৯৫০ সালে মাটির তলা থেকে যে পরিমাণ জল প্রতিদিন তোলা হত, এখন তার কুড়িগুণ বেশি তোলা হয়। অথচ মাটির তলার জলের ভাণ্ডার পূর্ণ করার চেষ্টা দিনকে দিন কমেছে। ভারতবর্ষে টাটকা জলের ৮০%-এরও বেশি চাষে ব্যবহার হয় এবং এর সিংহভাগই রাসায়নিক ব্যবহার করে যে পণ্যশস্য উৎপাদন হয় তার পিছনে খরচ হয়। ২৫ একর জমিতে জোয়ার বাজরা বা ভুট্টা চাষে যে পরিমাণ জল লাগে, রাসায়নিক ব্যবহার করে এক একর জমির আখ চাষে সম পরিমাণ জল লাগে।
- মনসান্টোর মতো বহুজাতিক সংস্থাগুলো প্রকাশ্যেই বলে যে তারা বীজ ও চাষের অন্য সব উপকরণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পৃথিবীর সমস্ত কৃষিব্যবস্থা নিজেদের কুক্ষিগত করতে চায়। ইতিমধ্যে বীজের বিশ্ব বাণিজ্যের প্রায় অর্ধেকটাই মনসান্টোর মতো বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলোর করায়ত্ত হয়েছে। এর মধ্যে বহু-বিতর্কিত *জিএম* শস্যের সবচেয়ে বড়ো ব্যবসায়ী হল মনসান্টো। এই কর্পোরেট সংস্থাগুলো কৃষিতে ব্যবহার্য রাসায়নিকের ব্যবসাতেও নেতৃত্বদায়ী স্থানে রয়েছে।
- বিদর্ভের এক জৈব চাষি শ্রী বসন্ত ফুটানে জানাচ্ছেন যে তাঁর এলাকায় বিটি তুলো ছাড়া অন্য তুলোর বীজ পাওয়া যায় না এবং গোটা অন্ধ্রপ্রদেশেও একই অবস্থা। তিনি বলছেন, এটা *বাজার দখলের* আগ্রাসী প্রচেষ্টার ফলাফল। তাঁর মতে, "আমাদের স্বাস্থ্যসম্মত দেশীয় বীজ যা বংশপরম্পরায় চলে আসছিল, তাকে বিটি তুলোর বীজ অবশ্যই সংক্রামিত করেছে। আমাদের বীজ, যা ভারতীয় কৃষি এবং লক্ষ-কোটি স্বনির্ভর জীবনের প্রাণস্বরূপ তাকে দূষিত করার অধিকার জিএম বীজকে কে দিয়েছে?"
- আমাদের পৃথিবীতে আমাদের জানা প্রায় ৮০,০০০ খাদ্যগুণসম্পন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ রয়েছে। তার মধ্যে অনেকগুলোই নানারকমের বৈচিত্র্যে পাওয়া যায়। কিন্তু আধুনিক বাণিজ্য-কৃষির বিস্তারলাভের পর, ২৫টারও কম প্রজাতির উদ্ভিদ সমগ্র গ্রহের মানুষকে খাদ্য সরবরাহ করে। ধান সহ বিভিন্ন রকমের খাদ্যশস্যের বিশাল বৈচিত্র্যময় ভাণ্ডারের প্রধান উৎস হিসেবে ভারতবর্ষ সুপরিচিত। আমাদের দেশে নথিভুক্ত ধানের বিভিন্ন ধরনের সংখ্যাই ৬০,০০০-এরও বেশি। কিন্তু উচ্চফলনশীল বীজের বামনাকৃতি ধান চালু হওয়ার পরে আমাদের দীর্ঘকায় দেশীয় ধান খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়ে উঠেছে।
- 'ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব অর্গানিক এগ্রিকালচার মুভমেন্টস' (IFOAM) জানিয়েছে যে জৈবচাষে জিএম শস্য ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। জিএম বীজ ব্যবহার করলে তাকে জৈবচাষ বলা যাবে না। এই ধরনের জিএম শস্য চাষ, যাকে *বিশ্ব অর্থনীতির সূর্যোদয় ক্ষেত্র* বলা হয়, তা জৈবচাষের মাধ্যমে উৎপন্ন ফসলের রপ্তানিকে দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত করছে।
- ভারতবর্ষে জৈবচাষের অনেক সফল উদাহরণ আছে, 'অর্গানিক ফার্মিং সোর্সবুক'-এ এদের খোঁজ পাওয়া যায়। প্রবীণ প্রাকৃতিক চাষি ভাস্কর সাভে এই চাষের এক প্রেরণাদায়ী দৃষ্টান্ত। তাঁর খামার এক প্রকৃত *খাদ্য-অরণ্য* — উচ্চফলনশীল, খরচ কম এবং তা অঞ্চলের গোটা পরিবেশকে জল, শক্তি ও উর্বরতা দান করে। পরিবেশ থেকে যা গ্রহণ করে, তার চেয়েও বেশি দান করে বলেই তাঁর খামার মোটের ওপর পরিবেশভোক্তা নয় বলা চলে। এই খামারটি কার্বন ডাইঅক্সাইডের মতো গ্রিনহাউস গ্যাস শোষণের মাধ্যমে বিশ্বউষ্ণায়নকে ঠেকায় এবং তা সম্ভাব্য সবচেয়ে কম খরচেই করে।

বসুন্ধরা দিবসের সভা
একটি বিবরণ

২২ এপ্রিল ২০১২ কলকাতার নির্মল চন্দ্র স্ট্রিটে বসুন্ধরা দিবসের ঘরোয়া সভায় অনেকেই সময় মতো পৌঁছে গিয়েছিলেন। প্রথমে দেহতত্ত্বের ওপরে স্বরচিত গান গাইলেন গৌতম চন্দ্র চন্দ। তারপর আরও দুটি রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইলেন পরমেশ গোস্বামী এবং দেবাশিস সেনগুপ্ত। সভায় প্রারম্ভিক কথা শুরু করলেন সৌরীন ভট্টাচার্য ওঁর লিখিত বক্তব্য পাঠ করে। এর সঙ্গে তিনি কিছু কথা সংযোজন করলেন। এছাড়া বসুন্ধরা দিবসের প্রাসঙ্গিক লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সুজয় বসু; ভরত মানসাটা উপস্থিত থাকতে না পারায় তাঁর লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন জিতেন নন্দী। এরপর উপস্থিত সকলের সরাসরি কথাবার্তা শুরু হয়।

সৌরীন ভট্টাচার্য : পরিবেশ সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে ধারণাগত একটা কথা বোধহয় মাথায় রাখা জরুরি। নানাভাবে পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে, পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে। কাজেই যারা পরিবেশ সচেতন তাদের কাজ সেই ক্ষতিকে মেরামত করা, আর নতুন করে ক্ষতি না করা। আমাদের মনের মধ্যে একটা ধারণা, পরিবেশকে সুস্থ করে তোলা সম্ভব।

আমাদের চারপাশে বিজ্ঞানীরা প্রকৃতিতে দুটো প্রক্রিয়া লক্ষ্য করেছেন। একরকমের প্রক্রিয়া, বারবার ঘুরে ঘুরে আসা। যেমন, আমাদের ঋতুচক্র। ... একটু বড়োভাবে বলতে গেলে এই প্রক্রিয়াতে যেটা ঘটে, সেটাই হল মেকানিকাল প্রক্রিয়া, মেকানিক্স নামক বিদ্যায় যেটাকে আমরা বোঝার চেষ্টা করি। এই প্রক্রিয়াতে যে পরিবর্তন ঘটে, ধরা যাক যদি তার নাম দেওয়া যায় 'লোকোমোশন' বা আবর্তন, মেকানিকাল সিস্টেমে বিজ্ঞানীরা তাকে তন্নতন্ন করে বোঝার চেষ্টা করেছেন।

আর এক রকমের প্রক্রিয়া আছে, এই বিজ্ঞান-দৃষ্টি দিয়ে তাকে বোঝা যাবে না। সেও আমাদের চারপাশের প্রকৃতিতে হচ্ছে। প্রক্রিয়াটা একমুখী। একদিক থেকে আর একদিকে যাচ্ছে, ঘুরে আসছে না। যেমন, আমাদের বয়ঃবৃদ্ধি। চব্বিশ বছরের মানুষের সঙ্গে চুরাশি বছরের মানুষের যে গুণগত পার্থক্য, এই পরিবর্তনকে হিসেবের মধ্যে রাখা দরকার।

এই দুটো প্রক্রিয়ার ধারণা ব্যবহার করে পরিবেশ চর্চায় গেলে ভয়ানক বিপদ। মানুষের অস্তিত্ব, প্রাণের অস্তিত্ব, ঘটনাটার মধ্যেই গোলমালটা হয়ে আছে। আমরা যত চেষ্টাই করি, আমাদের মেহনত শুভেচ্ছা ইত্যাদি হয়তো কিছুটা নষ্ট হবে। এই বিপদের কথাটা চৈতন্যের মধ্যে থাকলে আমাদের আচার-আচরণ আর একটু সংযত হতে পারে। আমরা জন্ম ইস্তক যেমন মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছি, তেমনি আমরা আছি এই ঘটনার মধ্যেই আমাদের বিলুপ্তি প্রায় অনিবার্য।

দেবাশিস সেনগুপ্ত : এই যে প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর চাপ পড়ছে, এখন কথা হল, আমরা সবাই একভাবে প্রকৃতি থেকে নিতে চাই। একরকম জীবনযাত্রা, একরকম ভালোমন্দ বোধ, একরকম ভোগের সম্ভাবনা, একরকম ভোগের আদর্শ, এই একভাবে যদি চাপটা পড়তে থাকে ... ধরুন সবাই যদি মনে করি আমাদের আলুভাজা খেতে ভালো লাগে, আলুভাজার জন্য আলুর দরকার, তেলের দরকার। শুধু আলুভাজা খেতে ভালো লাগে না, আলুভাজাটাকে প্যাকেটে রাখলে বেশি ভালো লাগে। তাহলে সেটার জন্য যে ধরনের চাপটা পড়ে, সেই জিনিসটা একটু বেশি হয়ে যায়। এই যে লোকোমোশন বা সাইক্লিক মুভমেন্টের কথা হচ্ছিল আর একমুখী চলন, এই কথাবার্তাগুলো তো নিষ্পত্তি করার মতো নয়, সবরকমই রয়েছে। এখন একভাবে চলছে। প্রকৃতি যখন যাত্রা শুরু করেছিল, তখন পৃথিবীটা সকলের বাসযোগ্য ছিল না। আবার যখন পৃথিবী যাত্রা সম্পূর্ণ করবে, তখন সেটা সকলের বাসযোগ্য থাকবে না। মাঝখানের একটা সময় মোটামুটি বাসযোগ্য, সেটা একটু এদিক-ওদিক হলে আমাদের সর্বনাশ। এক ডিগ্রি তাপমাত্রা বাড়লে আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে। ভারসাম্যটা রাখা আমাদেরই দায়, প্রকৃতির দায় নয়। আবার আমাদের রকমটা দেখা যাচ্ছে, আমরা একরকম পছন্দ করি। অথচ আমাদের মন এবং তার স্বভাবের মধ্যে কত বৈচিত্র্য আছে। এই একমুখী পছন্দটার সঙ্গে আমাদের ট্রাডিশনেরও যোগ আছে। আমাদের মনের মধ্যেই ট্রাডিশন অনুসরণ করার একটা প্রবণতা রয়েছে। এই ট্রাডিশন একসময় ধর্মকে কেন্দ্র করে এসেছে, এখন হয়তো ইকনমিকস্‌কে কেন্দ্র করে আসছে। যাই হোক, একটা ঝোঁক অনুসরণ করে চললে যেন আমরা নিরাপদ বোধ করি। আমাদের নিরাপত্তার বিষয়টা যদি আমরা মোকাবিলা না করতে পারি, আমার মনে হয় এর থেকে বেরোনো মুশকিল। নিরাপত্তা আমরা কেন চাই? যেন খেয়ে-পরে থাকতে পারি, ছেলেপুলে নাতিনাতনি যেন ভালো থাকে। অথচ প্রকৃতিকে রক্ষা করব যে বিপদের কথা ভেবে, সেটা আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি না, এটা একটু অসম্ভব লাগে। আমার অসুবিধা যদি কোথাও থাকে সেটা এই মুহূর্তের, সুবিধা যদি কিছু থাকে সেটাও এখনকার। কিন্তু আমি এখন বেশি খেয়ে ফেললে অন্য লোকে পাবে না, এভাবে ভাবাটা একটু কঠিন। আমাদের পরিবেশের সমস্যা নিয়ে কথাবার্তা বড্ডো বেশি দূরের দিকে তাকিয়ে হয়।

সৌরীন ভট্টাচার্য : পরিবেশের সমস্যাটাই একটু দূরের। একটা জিনিস খেয়াল করুন, আঠারো শতকের ত্রিশের দশক থেকে যখন শিল্পবিপ্লব শুরু হল, তখন তো কয়লা ফুরিয়ে যাচ্ছে, তেল ফুরিয়ে যাচ্ছে, এই হাহাকার ওঠেনি। আজকে উঠছে কেন? লক্ষ লক্ষ বছর ধরে যে জীবাশ্ম জ্বালানি জমা হয়েছিল, শিল্পবিপ্লবের ফলে সেটা আমরা ব্যবহার করে ফেললাম। আজকে আমাদের শিক্ষাকে পুনর্নির্মাণ করতে হবে, এখানে এবং এখনই-তে আটকে থাকলে চলবে না। একথা ঠিক, পরিবেশের ভাবনা মানেই একটু দীর্ঘমেয়াদি ভাবনা।

কুনাল গুহরায় : একটা প্রশ্ন আপনার কথাতেই মনে এল, সীমাহীন লোভ, আমি কত পুরুষের জন্য রেখে যেতে পারি? আমার ভালোবাসাটা গভীর, তাই আমি একটু দূর পর্যন্ত ভাবছি। যার ভালোবাসা কম, সে অত ভাবছে না।

সৌরীন ভট্টাচার্য : আপনি পরবর্তী প্রজন্মের জন্য ভাবছেন, সেটা আপনারই চিন্তা, পরবর্তী প্রজন্মের নয়। আপনি একটা শক্তপোক্ত বাড়ি পরের প্রজন্মের জন্য বানিয়ে গেলেন। সেই বাড়ি পরের প্রজন্মকে আকর্ষণ করছে না। আমরা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য যা করছি তা কিন্তু আমাদেরই সিদ্ধান্ত। ১৯৬০-এর দশকে যে কৃষি-প্রযুক্তি আমরা গ্রহণ করেছি, যাতে এতটা ব্যাপকভাবে এনার্জি ব্যবহার করতে হচ্ছে, যে এনার্জির ২০-২৫% আমরা উৎপন্ন করতে পারি না, মরীয়াভাবে বাইরে থেকে সেই এনার্জি বা তেল সরবরাহ করতে হচ্ছে, এ সিদ্ধান্ত তো আজকের প্রজন্ম নেয়নি।

দেবাশিস সেনগুপ্ত : আমি কিন্তু বলিনি যে 'এখানে এবং এখনই' করে ভাবতে হবে। আমি যেটা বলতে চাইছি, ভাবার ওপরে

ব্যাপারটা ছেড়ে দিলে এরকম হওয়াটাই স্বাভাবিক।

সৌরীন ভট্টাচার্য : ভাবার ওপরে তো আপনাকে ছাড়তে হবে। কারণ আপনি যা-ই করছেন, তার পিছনে — আপনি দেখতে পান বা নাই পান — একটা ভাবনার আদল আছে। যে প্রশাসনের তরফ থেকে ওই কৃষি-প্রযুক্তিকে বেছে নেওয়া হয়েছে, তার পিছনে দীর্ঘদিনের ভাবনা আছে, কয়েকশো বছরের ভাবনা আছে।

পরমেশ গোস্বামী : আজকে ধরুন ঘটা করে একটা তিথি ধরে, যেমন পয়লা বৈশাখ হয়, অক্ষয় তৃতীয়া হয়, আজ বসুন্ধরা দিবস পালন করব! বসুন্ধরা বিপর্যস্ত হওয়ার কারণ হচ্ছে এইটা। যে সামাজিক সংস্কার থেকে ব্রাহ্মণ কায়স্থ ভেদগুলো, সামাজিক আচার, রীতি আমাদের রক্তের মধ্যে একেবারে গভীরভাবে প্রোথিত রয়েছে। ঘটা করে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটা অনুষ্ঠান করছি। অনুষ্ঠানের মধ্যে একটা পলায়ন আছে। আমি প্রতি মুহূর্তে ওই সুখটা দিতে পারব না। একটা অনুষ্ঠান করে আমি অপরাধবোধ থেকে বাঁচতে পারি। ঘটা করে শ্রাদ্ধ করা হয়। একটা প্রবাদ আছে, 'বাঁচতে দিলে না ভাত-কাপড়, মরতে করলে দানসাগর'! উৎসবের পিছনে এরকম একটা ভাবনা আছে যে আমরা বসুন্ধরাকে নিয়ে খুব ভাবছি! এটা পচা ঐতিহ্যবাহী একটা অভ্যাস। ঘটা করে সত্যনারায়ণের স্তুতি করছি কিংবা মার্ক্সের স্তুতি করছি, এগুলো সব সমাজ থেকে পেয়েছি। আমরা তুলনা করতে শিখেছি। তোমার ভাবমূর্তিটা ভালো হবে, তুমি আর একটু পড়াশুনো করো, তোমার চাকরিতে উন্নতি হবে। এই যে তুলনা করে, তোমার থেকে আমি আলাদা, আমি একটা বিশিষ্ট কিছু। এইটা সামাজিক সংস্কারের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে আছে। আমি তো এই ঐতিহ্য থেকে মুক্তও হতে পারি। যেমন, আমরা বলি, অমুক খুব হিংসা করে, আর অমুক অহিংস। কিন্তু হিংসার অতীত একটা কিছু আছে, যেখানে তুলনা বাস করে না। ভাবনা তো পরে, আগে ডাইরেক্ট অ্যাকশন। এমন একটা ঘটনা ঘটতে চলেছে, যেখানে আলাদা করে ভাববার কোনো অবকাশ নেই। যদি বলি পৃথিবীর এরকম অবস্থা হয়েছে, তাহলে তিথি, পাঁজি এসব থেকে একেবারে মুক্ত হয়ে কিছু করা দরকার।

দেবাশিস সেনগুপ্ত : আমি একটু আগে যেটা বলছিলাম, এই সূত্রেই কথাটা। আমাদের যে অনুসরণ করার প্রবণতা, চিন্তার যে ক্ষেত্রটা তা এইভাবেই তো অকুপায়েড ...

পরমেশ গোস্বামী : আমি নিজে তো সীমাবদ্ধ। সীমাবদ্ধ হয়ে আমি অসীম জিনিসগুলো ধরে ফেলছি!

জিতেন নন্দী : আমরা আজকে বসেছি ঠিক কথা। কিন্তু আমরা তো শুধু আজকেই বসিনি। নানান সময়ে আমরা কথা বলি। আমাদের মধ্যে অনেকেই এখানে নানান ডাইরেক্ট অ্যাকশনের সঙ্গে যুক্ত। তাদের মধ্যে কথাবার্তার কি প্রয়োজন নেই?

কুনাল গুহরায় : একটা কথা বলব? আমাদের সংস্কৃতিতে সরস্বতী পুজোয় হাতে খড়ি হয়। তার মধ্যে কেউ বেশি লেখাপড়া শেখে, কেউ কম শেখে। কিন্তু শুরুটা তিথি মেনেই হয়। সুতরাং তিথি দিয়ে শুরু করে যদি আস্তে আস্তে মনের মধ্যে গেঁথে ফেলা যায়, যদি পাশের মানুষটাকে একটু বোঝাতে পারি, তাহলে এতে মন্দটা কী?

অর্জুন দাস : দিনটাকে গুরুত্ব দেব, না বিষয়টাকে গুরুত্ব দেব? দিনটাকে পালন করেও বিষয়টাকে গুরুত্ব দেওয়া যায়।

কুনাল গুহরায় : পৃথিবীর নিজস্ব কোনো সীমারেখা নেই, নিজেকে নিজে ভাগ করেনি। ভাগ যা করার আমরাই করেছি। এই বিষয়ে আমাদের সচেতন থাকা দরকার। চীন যদি ব্রহ্মপুত্রকে আটকে দেয়, আমরা যে কী সর্বনাশে পড়ব তা বলার নয়। আমার প্রয়োজনে নদী তৈরি হয়নি, আমার প্রয়োজনে পাথর থেকে মাটি হয়নি। কোনো বিজ্ঞানী মাটি তৈরি করেনি, সময় ও কালের আবর্তে বিষয়গুলো হয়েছে। কিন্তু এই কালের আবর্তকে আমি অস্বীকার করি। আমার অহং, আমার মানবীয় সত্ত্বা আমাদের ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। একে অপরের ওপর আমরা এমনভাবে আধিপত্য বিস্তার করতে চাইছি, আমরা বুঝছিই না কোথায় কীভাবে আমরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে চলেছি। একটা প্রজাতি ডাইনোসর ৪০ কোটি বছর পৃথিবীর বুকে রাজত্ব করে বিবর্তনের নিয়মে লুপ্ত হয়েছে। আর আমরা মানুষ এত জ্ঞানী, ২৫ লক্ষ বছর আমরা কাটাতে পারছি না! মুক্ত অভিপ্রয়াণ যদি সম্ভব হত, সেটা প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক। আবার ভাবি একটা প্রয়োজনেই তো এই গণ্ডি, বর্ডার ইত্যাদি তৈরি হয়েছিল। তবে প্রকৃতির ওপরে কর্তৃত্ব করতে চাওয়াটা ঠিক নয়। জল আসা-যাওয়ার স্বাভাবিকতাকে আটকানো উচত নয়।

প্রতিমা দত্ত : এখন আমার একটাই পরিচয় আমি পরিবেশ-কর্মী প্রয়াত তপন দত্তের স্ত্রী। এখানে দুটো সমস্যা উঠে এল। একটা হচ্ছে আমরা তিথি ধরে কাজ করব কিনা, আর একটা হল আমরা সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন নেব কিনা। আমার মনে হয় দুটোরই প্রয়োজন আছে। তিথি পালনের প্রয়োজন আছে কেন? আজ জলের বা জলাভূমির প্রয়োজন কী, আমি যদি তা রাস্তায় ডেকে একটা লোককে বোঝাতে যাই সে শুনবে না। কিন্তু আপনারা যারা এখানে এসেছেন কিছুটা জেনে বুঝে এসেছেন, আমার মতো একজন যে বসুন্ধরা দিবস সম্পর্কে কিছু জানে না, এখানে এসে এতগুলো লোকের সঙ্গে পরিচয় হল, এতগুলো লোকের সঙ্গে শেয়ার করা হল, মানসিকভাবে একটা যোগাযোগ তৈরি হবে বলে মনে হয়। আর সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশনেরও কিন্তু প্রয়োজন আছে। আমি যদি দেখি আমার চোখের সামনে একটা কিছু ঘটে যাচ্ছে যাতে আমার ক্ষতি হবে বা আমার চারপাশে অন্যদের ক্ষতি হবে, আমায় কিন্তু একটা সিদ্ধান্ত সঙ্গে সঙ্গে নিতে হবে। এই সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে আমার স্বামী মারা গেছেন। এখানে কথা হচ্ছে দূরের চিন্তাভাবনা নিয়ে। আমার স্বামী দূরের স্বপ্নটা দেখেছিলেন।

জিতেন নন্দী : তপন দত্ত যে কাজটা হাতে নিয়েছিলেন, জলাভূমি রক্ষা করার, সেটা কিছুটা থমকে গেছে, তার কারণটা কী?

প্রতিমা দত্ত : প্রথমবার হাইকোর্টের রায়ে জলাভূমি ভরাট করা বন্ধ হয়েছিল। তারপর কিছু মাস্‌লম্যান নিয়ে কোম্পানির লোকেরা ভর্তি করছিল। ছেলেদের নানারকম ভয় দেখানো হয়েছে, যেমন, আমার স্বামীকেও বহুবার মেরে দেওয়ার ভয় দেখানো হত। প্রলোভন দেখানো হয়েছে, তোমার কী দরকার বলো। তোমাকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দিয়ে দিচ্ছি, ফ্ল্যাট দিয়ে দিচ্ছি। কারণ ওদের হাতে প্রচুর পয়সা। প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকার প্রজেক্ট। আমার স্বামী হয়তো পুরো পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে জলাভূমির ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করতে পারেননি। কিন্তু আমরা যে এলাকায় থাকি, বালি-জগাছা ব্লক, তার জন্য ওই জলাটার বেশি প্রয়োজনীয়তা ছিল। তারপর ওঁকে যখন মেরে ফেলা হল, ওঁর সঙ্গে যেসব ছেলেরা কাজ করছিল, তাদের রীতিমতো ভয় দেখিয়ে দেওয়া হয়। যেমন, আপনারা এইমাত্র

শুনলেন, কুনালদাকে মাওবাদী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। কারণ কিন্তু একটাই। প্রশাসনের কাছে এই খবরটা আছে — কুনাল গুহরায়, শান্তনু চক্রবর্তী এই ব্যাপারটায় উদ্যোগ নিয়েছেন। এইভাবে সবাইকে চেপে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। আমাকেও প্রতিনিয়ত হুমকি দেয়, ধমক দেয়। 'তোমার ক্ষতি হতে পারে।' আমার দুটো মেয়ে। 'তোমার মেয়েকে কিডন্যাপ করে নেওয়া হতে পারে।' অতি সাধারণ মানুষ চিন্তা করে, আমার প্রাণটা অন্তত বাঁচুক। এইজন্য একটু থমকে গেছে। তবে প্রতিবাদ থেমে যায়নি। শিল্পমন্ত্রী পার্থ চ্যাটার্জি যখন হোসিয়ারি পার্ক উদ্বোধন করতে গেছেন, আমি নিজে গেছি ওখানে। যারা সিন্ডিকেট তৈরি করেছে তারা এলাকার লোক। মাফিয়াদের গ্যাঙ ঢুকছে এলাকাতে। আমি না হয় মনে সাহস নিয়ে ঢুকে যাচ্ছি, যা হয় হবে। কিন্তু সবাই তো সেটা পারছে না। আমায় সেদিন সবাই বারণ করেছে, তুমি যেও না। পার্থ চ্যাটার্জি গেছেন, একটাও ভালো লোক নেই ওখানে, সব অ্যান্টিসোশাল ক্রিমিনালে ভর্তি, প্রায় দুশো–আড়াইশো জন। হাওড়া হুগলি চারদিক থেকে যত অ্যান্টিসোশাল জড়ো হচ্ছে। আমি কিন্তু ঢুকে গেছি। কিন্তু ছেলেরা সব বাইরে আছে। তাদের যদি আক্রমণ করে দেয়, তাদের পরিবারের কী হবে? আমি তো স্বামীকে হারিয়েছি, আমি আর এখন সমাজবিরোধীদের দেখে অত ভয় পাই না।

রঞ্জন সরকার : প্রায় পনেরো–কুড়ি বছর আমি কতকগুলো বিষয়ে জড়িয়ে গেছি এবং এখনও জড়িয়ে আছি। এগুলোকে বিচ্ছিন্ন বলে মনে হয় না। গতকাল আমি নোনাডাঙায় গিয়েছিলাম। ওখানে মানুষ যে অবস্থায় রয়েছে আর কফি হাউসের বারান্দায় থাকত কামান বলে যে ছেলেটা, যে মারা গেল, সবাই আমাদেরই লোক কিংবা আমরা ওদেরই অংশ। ওদের পরিণতিগুলো মোটামুটি একইরকম।

যে আলোচনাটা এখানে হচ্ছে, সে সম্পর্কে কিছু বলি। প্রথমত আমার সবচেয়ে ভালো লাগছে, এই কথাগুলো নিয়ে একটা দিনের জন্য হলেও আজকে বসতে পেরেছি। দিবস বা তিথি যা–ই হোক, যারা যারা এইসব বিষয় নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়, অর্থাৎ যাদের স্পর্শ করে, তাদের কাছাকাছি থাকা দরকার। সেটা কবে কীভাবে হবে বলা মুশকিল। আজকে হয়ে গেল। ফলে এটা ভালো, নিয়মিত যদি হয় আরও ভালো। হয়তো এখান থেকেই নিয়মিত হওয়ার দিকে এগোনো শুরুও হতে পারে।

আমার বাড়ির সামনেও একটা জলাভূমি আছে। আমার বাড়ির এলাকাটায় ১৯৮৫ সাল থেকে আমার যাতায়াত। এখন ১৯৯৫ সাল থেকে ওখানে আছি। ১৯৮৫ সালে যখন যেতাম, তখন কয়েকটা জলাভূমি ছিল, কিছু মাঠ ছিল। আমরা যার বাড়িতে যেতাম, শর্টকাট করার জন্য ওই পথটা বেছে নিতাম। এখন সেখানে মাঠ একটাও নেই, ছোটো পুকুর দুটো আছে। বাদবাকি সব ফ্ল্যাটবাড়ি হয়ে গেছে। আমরাও একটা ফ্ল্যাটবাড়িতেই থাকি। ওই যেটুকু রয়ে গেছে, সেটুকুও কোনোদিন বুজিয়ে দেবে। তখন হয়তো এখানে যাঁরা জলাভূমি রক্ষা করার চেষ্টা করছেন, তাঁদের দরকার হবে। আজকে এসে ভালো হল, আমি তাঁদের চিনে গেলাম। তাঁরা কী করছেন, সেটাও একটু জানতে পারলাম। সেদিক থেকে আজকের কথাবার্তা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয় যে কথাটা সৌরীন ভট্টাচার্যের বক্তব্যে, বিশেষত সুজয় বসুর বক্তব্যে ছিল, ভোগবাদ কথাটা বারবার আসছিল। ভোগবাদ কথাটা শুনলে আমার মনে হয়, এটা রোখবার আর একটা জায়গা আছে, সেটা হল ত্যাগবাদ। স্কুলজীবন পেরিয়ে এসে আমি যেভাবে বড়ো হয়েছি, যাদের সঙ্গে বড়ো হয়েছি, সেখানে ত্যাগ শব্দটা ছিল সেকেলে, বহুব্যবহৃত, মিথ্যা। আমাকে বোঝানো হয়েছে, এরকম কিছু হয় না। অথচ তারও আগে আমার ছোটোবেলায় পড়ানো হত, ত্যাগ জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ছোটোবেলায় বিবেকানন্দের যে জীবনীটা পড়ে ভালো লেগেছিল, ছবিতে গল্পের আকারে পড়েছিলাম, বাড়ির ওপর থেকে বিবেকানন্দ শাড়ি–জামাকাপড় নিচে ফেলে দিচ্ছেন। ওঁকে আটকে রাখা হয়েছে, কারণ তিনি সব দিয়ে দিতেন। এটা আমার প্রচণ্ড ভালো লাগত। আমি কৃষ্ণনগরে থাকতাম। আমার যখন তেইশ–চব্বিশ বছর বয়স, কলকাতায় এসে দেখতে পেলাম, মানুষ ফুটপাতে থাকে। ফুটপাতে মানুষ থাকে এটা আমার কৃষ্ণনগরে দেখা ছিল না। খাবার রুটি শুকিয়ে রাস্তায় রাখা হচ্ছে, শারীরিক সম্পর্ক হচ্ছে বৃষ্টির মধ্যে রাস্তায়, এগুলো দেখা ছিল না। এগুলো দেখেও আমি চলে যেতে পারছি, এটাও আমার দেখা ছিল না। আমার গায়ে লাগছে না। কষ্ট পাওয়াটা বোধহয় এখানে মানুষ ভুলে গেছে। ছোটোবেলায় পড়েছি বুদ্ধের জীবন, চৈতন্যের জীবন। আসলে আমরা এখানে কিছু নিতে আসিনি। যেহেতু পৃথিবী আমাদের সবকিছু দিয়ে এসেছে, আমাদের কাজ হল সব কিছু দেওয়া। এখানে রবীন্দ্রনাথের একটা গান মনে পড়ে, 'আমার যে সব দিতে হবে, সে তো আমি জানি'। কথাটা হচ্ছে এটাই, আমরা এখানে কিছুই নিতে আসিনি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, একটু আগে সৌরীন ভট্টাচার্য যেটা বলছিলেন, আমরা যে এই একটা পৃথিবী পেয়েছি, এর চাইতে আমার অন্তত আর কিছু চাওয়ার নেই। সবচেয়ে বড়ো আনন্দের সংবাদ হল, আমি জন্ম নিতে পেরেছি এবং মানুষ হিসেবে জন্মেছি। অন্য কোনো জীব হয়ে জন্মালে কী হত, আমি তো সেভাবে জন্মাইনি, আমি বলতে পারব না। আমি যে মানুষ হিসেবে জন্ম নিতে পেরেছি, সেটা এই পৃথিবী থেকে পেয়েছি। দুঃখও পেয়েছি। কিন্তু সবচেয়ে বেশি যা পেয়েছি, তা হল আনন্দ। আলোটা দেখতে পেয়েছি তো, নিঃশ্বাস ফেলতে পেরেছি তো। এত গাছপালা তো পেয়েছি, যার থেকে খাবার পাচ্ছি। এত পশুপ্রাণী পেয়েছি, যাদের গায়ে হাত বুলালে তারা কাছে আসে। যাদের দেখতে খুব সুন্দর ...। একটু আগেই দেবাশিসদা একটা কথা বলেছেন, আমি তার একটা ছোট্ট বিরোধিতা করি। বিষয়টা হল, দূর আর কাছের। এটা কিন্তু ব্যক্তি–নির্ভর দেখার বিষয়। আমার কাছে দূরত্বের কোনটা, ভবিষ্যতের কোনটা, সেটা কিন্তু ব্যক্তিমানুষের ওপরও নির্ভর করে।

যেমন, ওই ছেলেটি যখন অসুস্থ হয়েছিল — কামান নামে ডাকা হত ওকে, ওর নাম নয়, কারণ ওদের নাম তো পাল্টে যায়। পরে ওর পরিচয় আর নামও জেনেছিলাম — আমার মনে হয়েছিল, আমার বাড়িতে যত বিপর্যয়ই ঘটুক, ওকে দেখাটা আমার কাছে বেশি জরুরি। এটা হয়তো একটু স্বার্থপরের মতো শোনাচ্ছে। তাতে আমার বাড়ির কিছু বিষয় অবহেলিতও হতে পারে। কাছে দূরের দেখার একটা তফাত হয়ে যাচ্ছে, শুধু এটুকুই বলতে চাইছি। একজন বৃদ্ধাকে আমি আটমাস একটা হাসপাতালে ভর্তি করে রেখেছি, তিনিও পথে থাকতেন। আমার মায়ের মৃত্যু বা ওই বৃদ্ধার মৃত্যু, আমার মায়ের অসুস্থতা বা ওই বৃদ্ধার অসুস্থতা, এই দুইয়ের মধ্যে খুব বেশি তফাত আমি করতে পারছি না। মাকে আমি অনেক কাছ

থেকে দেখতে পাই। ওই বৃদ্ধাকে একটু দূর থেকে দেখি। তবু আমার অনুভবের মধ্যে, উপলব্ধির মধ্যে ওঁর উপস্থিতি কম নেই। মা যতক্ষণ আছেন ততক্ষণ আমার বাড়িতে কিছু পয়সা আছে আর বাবাও আছেন বা অন্য কেউ আছে, মায়ের ব্যাপারটা ম্যানেজ হয়ে যাবে। ওঁকে দেখার জন্য কিন্তু আমি ছাড়া কেউ নেই। তাহলে আমাকে ওখানে থাকতেই হবে, মায়ের কাছে থাকি আর নাই থাকি। আমি বলতে চাইছি, আসলে এই দূর-কাছের ব্যাপারটাও একটু অন্যরকম।

আমি অনেকদিন আগে পর্যন্ত গায়ে মশা বসলে মারতাম। আজ প্রায় ছ-বছর হল, কোনো প্রাণীকেই মারতে আমি রাজি নই। একটা সাপকেও নয়। আমার বাড়িতে বিছে থাকলে তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি, কিন্তু মারি না। ঘরের ঝুল পরিষ্কার করি না, মাকড়সা মারা যাবে বলে। চেষ্টা করি যতদূর সম্ভব।

গতকাল একটা ছেলের সঙ্গে কথা হচ্ছিল, মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। ঘাটশিলায় একবার বেড়াতে গেছি। চলে আসার সময় সঙ্গে যে বন্ধুবান্ধবরা গিয়েছিল, তারা অনেক জিনিস নিয়ে এসেছে। আমি একটা পাথর নিয়ে এসেছিলাম। পাথরটা ঘরে একটা পুরোনো আলমারির মধ্যে রাখা ছিল। অনেকদিন পরে যখন দেখতে গেলাম, পাথরের গায়ে সাদা নুনের মতো একটা আস্তরণ পড়েছে। ভূতাত্ত্বিকরা বলে দেবেন কারণ কী। আমার মনে হয়েছিল, পাথরটা কেঁদেছে। তখন আমি ঠিক করি, আর একবার ঘাটশিলায় গেলে পাথরটা রেখে আসব। বিজ্ঞানীরা বলতেই পারেন এই কারণে হচ্ছে, কিন্তু আমি যুক্তিটা মানতে পারব না। আমি বিশ্বাস করি, পাথরটা কেঁদেছে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে গিয়ে একবার একটা ফুল তুলেছিলাম। তখন আমার যথেষ্ট বয়স। আমাকে গাছের গায়ে ফুলটা রেখে আসতে হল। আমার মনে হয়েছিল, ফুলটাকে আমি কষ্ট দিচ্ছি এবং গাছটাকেও।

আমার মনে হয় সমস্ত পৃথিবী এইভাবে জড়িয়ে আছে। প্রকৃতির ভিতরে যতরকম প্রাণ আছে, মানুষ আছে, একটা অনুভূতি হয়, প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সবটা যুক্ত নয়। পৃথিবী বাঁচাব কেন? পৃথিবীর ভবিষ্যৎ খারাপ হয়ে যাচ্ছে, এই ভেবে কাজ তো করা যায়ই। অনেকে তা নিয়ে অনেক কিছু করছেন। আমি কিছুই করি না। কিন্তু প্রয়োজনীয়তার বাইরেও আর একভাবে করা যায়। সেটা হচ্ছে, পৃথিবী ছাড়া তো আমার কিছুই নেই। সে আমাকে ভালোবাসে, ভালোবাসার জনকে তো নিজের চেয়েও বেশি ভালোবাসতে পারি।

যাঁরা পরিবেশ ইত্যাদি নিয়ে ভাবেন বা কিছু করেন, তাঁদের মধ্যেও কখনো কখনো দেখেছি, প্রয়োজনীয়তার বোধটা বেশি বড়ো হয়ে যায়। যেমন, এই ছেলেটির দু-বার টিবি হয়েছিল এবং আরও অনেক অসুখ ছিল। ওর সমস্যা হল, থাকবে কোথায়? দ্বিতীয়বার যখন টিবি হল, তখন আমার বাবা মারা গিয়েছিলেন, কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় আসতাম না। বাবা মারা যাওয়ার পরে বাবার একটা স্মরণসভা করব, ওকে জানাব — ও বাবাকে ভালোবাসত, আমার বাড়িতেও যেত, কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসের তিনতলায় প্যাসেজটাতে ও থাকত — বইয়ের প্রকাশক বা অন্যরা আমাকে বললেন, ওর মুখ দিয়ে রক্ত পড়তে ওঁরা দেখেছেন, ও কাশছিল। ওঁরা আরজিকর হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়েছেন। ওঁরা বললেন, আপনি গিয়ে ওখানে দেখুন। পরদিন বাবার স্মরণসভা মিটে যাওয়ার পরে আমি আরজিকরে গেলাম। পরের তিন-চারমাস আরজিকরের ডাক্তারদের কাছ থেকে নানান সহযোগিতা পেয়েছিলাম। ওখানেই কামানের প্রথম চিকিৎসাটা হয়। তারপর যখন বেড দখল করে রাখা যাচ্ছে না, তখন ওকে নিয়ে কোথায় রাখব? ওর থাকার একটা ভালো জায়গা দরকার। প্রথমেই বলে রাখা দরকার, আমার বাড়িতে এনে ওকে রাখতে পারিনি। কিন্তু যেখানে ও কুড়ি বছরের বেশি সময় কাটিয়েছে — দশ বছর বয়সে ও বাড়ি ছেড়েছিল, ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল — যাঁরা ওকে আরজিকরে ভর্তি করেছিলেন, তাঁরা আমায় একটা কঠোর নির্দেশ দিয়েছিলেন, ওকে যেন আর কফি হাউসে না আনা হয়। তার কারণও ওঁরা দেখিয়েছিলেন। এক তো ওর অসুখ, দ্বিতীয়ত ওর স্বভাবগত ব্যাপার। যেমন, ও কাজ করতে চাইত না, চেয়েচিন্তে চালাত। যারা ওখানে থাকত তারা কিছু বললে ও বিচ্ছিরিভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করত, রেগে যেত। সবকিছুই ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ। তার পরিণতিতে ওঁরা বললেন, 'আমরা কিন্তু ওকে কিছুতেই এখানে থাকতে দেব না'। কেউ কেউ এমনও বলেছিলেন, 'তুমি যে ওর জন্য করছ, কী লাভ? ও তো কিছু দেবে না।' একটা জায়গায় আমি আটকে যাচ্ছিলাম। যে মানুষগুলো ওকে চেনেন, তাঁরা বলছিলেন, 'ওর জন্য করে কী হবে?' আর এক বৃদ্ধার কথা বলছি, তিনিও কফি হাউসের ওপরে থাকতেন। তাঁর একদিন পেট খারাপ হল। বাকি সকলে মিলে ওঁকে নিচে নামিয়ে দিলেন। যেহেতু তিনি তিনতলার প্যাসেজটা নোংরা করে ফেলেছিলেন। তখন তিনি পথে থাকতে লাগলেন। ওই মানুষেরা কিন্তু অনেকেই প্রগতিশীল, সামাজিক কাজে তাঁদের অংশও রয়েছে। আমার এই কাজ চালিয়ে যেতে অর্থের দরকার পড়েছে। ওঁরা কোনো কোনো সময়ে অর্থ সাহায্যও করেছেন। কিন্তু একটা কোথায় দূরত্ব, এর পরে আর নয়। মেডিকাল কলেজে ওই বৃদ্ধাকে নিয়ে গিয়ে আমি বসে খাচ্ছি। ক্যান্টিনের ওয়েটার আমাকে জিজ্ঞেস করছেন, 'ওর খাবারটা কি এখানে দেব?' এরকম পরিস্থিতিতে আমি খুব হিংস্র হয়ে যাই, খুব রিঅ্যাক্ট করি। সমাজে এরকম একটা আটকানো জায়গা আছে। একটা ছেলে খুব খাটাখাটুনি করে, কিন্তু খুব সংযত। তার বেলায় ব্যবহারটা একটু অন্যরকম। কিন্তু কামানের বা ওই বৃদ্ধার জন্য নয়। তাই পুরো দরজাটাই খোলা দরকার। আলোটা সকলের জন্যই দরকার। আমাদের অপরাধীদের জন্য কি আলোটা আটকানো আছে? তা তো নেই। তাহলে আমি কেন বাছাই করে আটকাবো দরজাটা?

দমদম থেকে একজন মহিলা আসতেন এক ব্যাগ ভর্তি খাবার নিয়ে, ছোটো ছোটো কৌটোয়, শ্যামবাজার চত্বরে সব কুকুরদের খাওয়াতেন। আমার একটা বইয়ের দোকান ছিল, এখন সেটা চলে না, সেই দোকানের সামনে এক ভদ্রলোক সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিলেন, একটা কুকুর তাঁকে কামড়ে দিয়েছিল। সেই ঘটনা দেখে কিছু লোক দলবদ্ধভাবে কুকুরটাকে পাগল বলে মেরে ফেলল। আমি বাধা দিতে গেলে ওরা বলল, এই লোকটাকে আগে মারো।

যদি দরজাটা খোলে, তবে সব প্রকৃতিই প্রয়োজনীয়, সব প্রাণীই প্রয়োজনীয়। আমাদের প্রয়োজন মেটাক বা না মেটাক, বাস্তব প্রয়োজনে লাগুক আর নাই লাগুক, পরস্পর পরস্পরের কাছে প্রয়োজনীয়। দৈনন্দিন কাজে লাগার বাইরে আর একরকমভাবে দেখা যায়। অপরকে ভালোবেসে একটা আনন্দ হয়। যে আনন্দ হয়তো সেই আদিবাসী মানুষটা পেয়েছিলেন, একজন রেড ইন্ডিয়ান যিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে একটা চিঠি লিখেছিলেন, "জঙ্গলের

ভিতরে যে ঘোড়া ছুটে বেড়ায়, যে ঈগল ঘুরে বেড়ায়, যে নদী পাহাড় আর ঝরনাগুলো রয়েছে, এরা সকলে আমাদের ভাই আর বন্ধু। তোমরা আমাদের জমি নিতে চাও নিয়ে নাও। কিন্তু তোমাদের লোকেদের বোলো, আমরা এদের যেভাবে ভালোবেসেছি, তারা যেন সেইভাবেই ওদের ভালোবাসে।"

শমীক সরকার : সঞ্জয় ঘোষ আয়লার সময় থেকে সুন্দরবনে যাতায়াত করছেন। দেউলবাড়ি, কুলতলি এলাকায় তখন থেকেই ওঁর যাতায়াত। গতকালও গিয়েছিলেন, ওঁর কাছ থেকে শোনা যাক।

সঞ্জয় ঘোষ : সুন্দরবনে ১৯টা ব্লক আছে। এর মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ১৩টা, উত্তর ২৪ পরগনায় ৬টা। এই ১৩টার মধ্যে একটা কুলতলি। কুলতলি ব্লকের ৪৭–৪৮টা গ্রামের মধ্যে একটা দেউলবাড়ি। দেউলবাড়ি অতি প্রাচীন একটি গ্রাম। হাজার–দেড় হাজার বছর আগের একটা মন্দির ওখানে পাওয়া গিয়েছিল। বর্তমানে যারা আছে, তারা একশো–দেড়শো বছর ধরে আছে।

কালকে গিয়েছিলাম ওখানে। গিয়ে মনটা আরও খারাপ হল। আমি তিন–চারমাস অন্তর যাই, কখনো ছ–মাস পরে যাই। আমি ভেবেছিলাম আগের চেয়ে ওদের ভালো দেখব। নদীর পারে যে বাঁধ আছে তার দুশো ফুট ভিতরে একটা রিং বাঁধ আছে। সরকার থেকে ঘোষণা হয়েছিল, জানুয়ারি মাসে বাঁধের কাজ হবে। ওরা বলল, হ্যাঁ অঘ্রাণ–পৌষ মাসে সরকার থেকে লোক এসেছিল। ওখানকার যে পঞ্চায়েত সদস্যা, তাঁর স্বামীই পঞ্চায়েতের কাজ দেখাশুনা করেন। তিনি বলেছিলেন, নদীর ওপর বর্তমানে যে বাঁধটা আছে, সেটা কোনোরকমে করা হবে, ভিতরের বাঁধটা ভালোভাবে করা হবে। দুটো বাঁধের মাঝখানে গাছ লাগানো হবে। বর্তমানে নদীর পারে যে বাঁধটা আছে, তার সামনেও গাছ লাগানো হবে। আমি ওদের সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারলাম, নদীর পারে গাছ হতে গেলে চর লাগবে। সেই চরের ওপরে গাছগুলো লাগাতে হবে। এখন চর কোথাও কোথাও আছে, কোথাও কোথাও নেই। ওখানে যারা সবচেয়ে দরিদ্র তারা চিংড়ির মীন ধরে। কাল দেখলাম প্রচুর মীন ধরা হচ্ছে। প্রচুর মহিলা ঢেউয়ের মধ্যে মীন ধরছে, বয়স্কারা আছে, বাচ্চারাও ধরছে। ১০০ মীন ধরলে ১০ টাকা রোজগার। ওরা মীন ধরে নিয়ে যায় কাঁটামারি বাজারে। সেখান থেকে ফিশারিতে যায় মীন। সারাদিনে কেউ ৩০০, কেউ ৪০০, কেউবা ১০০০ ধরছে। এই মীন ধরতে ওই যে নদীর পার ধরে ওরা হাঁটাহাঁটি করছে, চরটা ধুয়ে যায়, মাটিটা বসতে পারে না। এটা পরস্পর–বিরোধী একটা সমস্যা। যদি চরটা না হয়, তাহলে গাছ বসানো যাবে না। চর রাখতে গেলে মীন ধরা বন্ধ করতে হবে। মাঝে গিয়ে শুনেছিলাম, মীন ধরা বন্ধ আছে।

গতবারে দেখেছিলাম, এক জায়গায় বাঁধটা ভাঙা, হয়তো ৩০ ফুট হবে, ঢালের পিচিং ব্লকটা নেই। ওই জায়গাটা দিয়ে গ্রামে জল ঢোকে। এবারে দেখলাম ফাঁকটা বেড়ে গেছে, ১০০ ফুট হয়ে গেছে। চৈত্র মাসের প্রথম কোটালে নাকি জলের আঘাতে কিছুটা ক্ষয়ে গেছে। যেটা শুনে অবাক হয়ে গেলাম, স্থানীয় কিছু লোক নাকি ওখান থেকে ইট তুলে নিয়ে নিজেদের বাড়িতে ব্যবহার করেছে। একজন বৃদ্ধা আমাকে বললেন, 'আমি বারণ করতে গেলাম, আমাকে ওরা বলল, তুই কেন কথা বলছিস?' মানুষ এদিকে এইসব করে যাচ্ছে। অন্যদিকে দেখলাম, প্রকৃতির কীরকম দান, চরের মধ্যে ছোটো ছোটো গাছ গজাতে শুরু করেছে! আবার এই গাছগুলোও লোকে কেটে নিয়ে যাচ্ছে জ্বালানির জন্য। আমি অবাক হলাম, যাদের এই পরিবেশ নিয়ে ভাবার কথা, তাদের একটা অংশ কিন্তু পরোয়া করছে না।

আমি যখন সংবাদপত্রের পক্ষ থেকে যাই, ওখানকার লোকে বলে, কী হবে লিখে? ওদের অনেকেই খুব হতাশ।

আয়লায় ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়ি করার জন্য যে টাকা দেওয়া হয়েছে, কেউ পেয়েছে, কেউ পায়নি। যাদের ক্ষতি বেশি হয়েছে, এমন পরিবারও পায়নি। আবার কম ক্ষতি হয়েও পেয়ে গেছে। পেলেও কী হবে, তার পরিমাণটা এত কম, কিছু হয় না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, দশ হাজার টাকা পেয়ে কী করলেন? প্রত্যেকেই বলছে, একটা মাটির ঘরও এই টাকায় হয় না। একটা অ্যাসবেস্টস শিটের দাম দুই হাজার টাকা। তবে সবাই দশ হাজার টাকা পায়নি। আড়াই, পাঁচ, দশ এরকম চারটে ক্যাটেগরি আছে, কাঁচা বাড়ি আর পাকা বাড়ি, আবার তার মধ্যে আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত আর পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত। কেউ এই টাকা দিয়ে বাড়ি করেনি। যুবকেরা বলছে, পার্টির লোকেরা সব খেয়ে নিচ্ছে।

নদী একদিকে ভয়ঙ্কর বিপদ নিয়ে আসে, আবার সেটাই আয়ের উৎস। আগে এখানে উচ্ছে, কুমড়ো, ঢ্যাঁড়স আর প্রচুর লঙ্কা হত। এখন একদম হচ্ছে না। গরমকালে নোনাটা ফুটে ওঠে, কোনো সবজি ফলানো যায় না। গ্রীষ্মের চাষে খরচ বেশি, কিছু কিছু লোক ধান চাষ করেছে।

অমলেন্দু সরকার : পরিবেশের অবনমনের জন্য মানুষ দায়ী বলা হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতি নিজেও তো এই প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। যেমন, দাবানলে যে ক্ষতি হয় বা পরিবেশ দূষণ হয়, তা মনুষ্য সৃষ্ট কোনো অগ্নিকাণ্ডে সম্ভব হয় না। যেমন, আগ্নেয়গিরি থেকে যে গ্যাস বেরিয়ে আসে, তার জন্য যে ক্ষতি হয়, এক কোটি ফ্রিজ বা এসি মেশিন থেকে কি তা হয়? এগুলো পরিষ্কারভাবে জানা দরকার। আমাদের পরিবেশপ্রেমে একটা আবেগ থাকে, কিন্তু আবেগের চেয়ে যুক্তিটা বেশি জরুরি। যেমন, চাষ করার কথা হচ্ছে। চাষ করেই তো সবচেয়ে বেশি দূষণ হয়েছে। আমরা গাছপালা ধ্বংস করে ফেলেছি। তাহলে তো আমেরিকা থেকে জন জেরজান নামে যে মানুষটি এখানে এসে বলেছিলেন, পশুপালনের যুগে বা সংগ্রহের যুগে ফিরে যাওয়া, আমরা কি তার জন্য প্রস্তুত? দু–একটা ব্যতিক্রমী চরিত্র থাকতেই পারে। কিন্তু আমরা কি পারব সকলে?

আমি এই জায়গা থেকে বলব, রঞ্জন যেমন বলছিলেন, ওঁদের পাড়ায় তিন–চারটে পুকুর ভরাট হয়ে একটি পুকুর টিকে আছে। তিনি থাকেন একটি ফ্ল্যাটবাড়িতে। আমি জানি না সেই বাড়ি পুকুর ভরাট করেই তৈরি হয়েছিল কিনা। আমরা যারা এখানে বসবাস করছি, তারা অনেকেই নিচু জমিতে বাস করছি। আমি জলাভূমি নিয়ে আন্দোলনের সঙ্গে আমাদের জীবনকে মেলাতে পারি না। আজ যখন কেউ ভরাট করতে যাচ্ছে, আমরা আটকাচ্ছি। কিন্তু আমিও তো এই কাজটা করেছি। এটা আমার একটা বিভ্রান্তিকর অবস্থান।

সুজয়বাবু বললেন, এই মুহূর্তে ছাত্রদের মধ্যে কেউ কেউ অর্থপূর্ণ জীবন যাপন করতে চাইছে। আমার তা মনে হয় না। আমি নিজে টিউশন করি। ছেলেমেয়েদের অর্থপূর্ণ জীবনের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই নেই। কী করে অর্থ আসবে সেই নিয়েই ওদের মাথাব্যথা, অন্য কোনো কিচ্ছু ওরা ভাবে না। এটা পীড়াদায়ক হলেও সত্য। কিছু

ব্যতিক্রম থাকতেই পারে।

আমার প্রশ্ন হল, আমরা এখান থেকে বেরোব কী করে? সঞ্জয়দা যেমন বললেন, গ্রামের মানুষ খুব সরল সাদাসিধে, এটা একটা অলীক কল্পনা। যেমন, বাংলাদেশ থেকে যারা উদ্বাস্তু হয়ে আসে — যদিও তারা বাস্তুচ্যুত হয়ে আসে না, তারা বাস্তু বিক্রি করে আসে, বিশেষ বিশেষ সময়ে অন্যরকম হয়েছিল — তারা বলে, আমরা মুসলমানদের দ্বারা নিপীড়িত। এটা একদম মিথ্যে কথা। বাংলাদেশে বিশেষ বিশেষ জায়গা ছাড়া দাঙ্গা হয়নি। আমরা যে অঞ্চলে ছিলাম, সেখানে দাঙ্গা হয়নি। আমরা হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি বসবাস করেছি। একটা কাল্পনিক সন্ত্রাস, ভবিষ্যতে মুসলমানরা আমাদের মারধোর করবে। এরকম মিথ্যে কথা তারা বলে এবং আমরা বিশ্বাস করি। আমি দেখেছি, আমাদের অনেক বিদ্বজ্জনেরা এসব বিশ্বাস করেন এবং তার ওপর ভিত্তি করে মন্তব্য করেন।

এখানে তিথি বা পাঁজিপুঁথি দেখে সভা করার কথা হচ্ছিল। আমরা খবরের কাগজে পড়েছি মোবাইল টাওয়ার থেকে ক্ষতি হয়। সমস্যা হল, কীভাবে প্রতিবাদ করব? আমাদের পঞ্চসায়র নবদিগন্ত, পূর্ব যাদবপুর থানা এলাকায় মোবাইল টাওয়ার বসবে। আমরা একটা ভেস্টেড ল্যান্ডে বাস করি। সেইসময় শিল্পবিরোধী তকমা দেওয়ার একটা ব্যাপার ছিল। ২০০৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের কথা। আমি প্রথম যখন বললাম, আমার কথা উড়িয়ে দিল সকলে। বলল, শিল্পবিরোধী মনোভাবের জন্যই তোমরা মোবাইল টাওয়ারের বিরোধিতা করছ। শেষ পর্যন্ত আমরা অবশ্য কিছুটা বোঝাতে সক্ষম হই। ততদিনে মোবাইল টাওয়ারটা তৈরি হয়ে যায়। ওরা টেস্ট করে নিয়েছিল কিন্তু চালু করতে পারেনি। সেইসময় আমরা আর একটু সংগঠিত হই। মোবাইল টাওয়ার বসানোর ক্ষেত্রে যে নিয়মকানুন আছে, ওরা মানেনি। ওরা ভেবেছিল, কলোনি এলাকার লোক, বস্তিবাসী, এরা কিছু বোঝে না। যে বাড়িতে বসানো হয়েছিল টাওয়ার, সেই বাড়ির মালিক আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চাননি। তিনি বলেছিলেন, 'আমরা পয়সা পাচ্ছি, তোমরা ঈর্ষার জন্য বিরোধিতা করছ।' পরে অবশ্য অনেক বয়স্ক মানুষ এগিয়ে আসেন এবং বাড়ির মালিকও বোঝেন। তিনি কোম্পানির চেকটা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনটে চেক প্রত্যাখ্যান হওয়ার পর চুক্তিপত্র বাতিল হয়ে যায়। আমরা নাগরিক কমিটির মাধ্যমে উদ্যোগ নিই এবং পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডকে জানাই। কলকাতা কর্পোরেশনে আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন, ওঁর কাছে জানাই। আমরা কাউন্সিলারের সহযোগিতা পেয়েছিলাম। কোম্পানি ওঁকে আগে থেকে বধ করতে পারেনি। ২০১১ সালের ১১ ডিসেম্বর ওরা টাওয়ার ভাঙতে আসে।

মোবাইল টাওয়ারের রেডিয়েশনের ব্যাপারে আমরা এক বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যেই আছি। বিশেষজ্ঞরাও এব্যাপারে নীরব। আমাদের ভাবা দরকার এ নিয়ে কী করা যায়।

সূর্যাংশু ভট্টাচার্য : অর্থ উপার্জনই সব কিছু নয়, এরকম ভাবনার একটা ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। কেউ কেউ ভাবছে, মানুষের মধ্যে সবাইকে নিয়ে বাঁচা দরকার। আমার ছোটো দু-ভাই আমেরিকা গেলেও একভাই ফিরে এসেছে। সে মানুষের মধ্যে থাকতে চায় বলেই ফিরে এসেছে।

হিন্দুরা কিন্তু সত্যিই বাংলাদেশে মুসলমানদের দ্বারা নিপীড়িত হয়েছে। দাঙ্গার মধ্যে মৃত্যুকে সঙ্গী করে অনেকে চলে এসেছে। আমার শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়স্বজন এমনও আছেন, যাঁরা পালিয়ে আসার সময় রাস্তার মধ্যে কয়েকজনকে হারিয়ে এখানে এসেছেন। আমি গতবছরও বাংলাদেশে গেছি। এখনও কিছু ঘটনা ঘটে। এখানে উল্টোটা ঘটেছে, আমরা মুসলমানদের তাড়িয়েছি। আমরা প্রতিরোধ করতে গিয়ে তা আটকাতে পারিনি। এখানে হয়েছে, ওখানেও হয়েছে।

আমার মনে হয়, ধরিত্রী শুধু নয়, ধরিত্রীর ওপরে আকাশকেও নজরে আনা উচিত। আর প্রশ্ন করা উচিত, ধরিত্রী কাদের?

*****

এদিন বসুন্ধরা দিবসের কথাবার্তায় নানান স্বরে আমাদের পরিচিত বেশ কিছু বিষয় উঠে এসেছে, কিন্তু সবটার মধ্যেই বসুন্ধরা বা পৃথিবীর মাত্রাটা যেন বাঁধা ছিল। শেষে আবার গান শুনে সভার সমাপ্তি ঘটে। পাঠ করা তিনটি লেখা এই সংখ্যায় আলাদাভাবে ছাপা হয়েছে।

মন্থন সাময়িকীর গ্রাহক হোন।

ডাকযোগে সারা বছরের ছ-টি সংখ্যার গ্রাহক চাঁদা পঞ্চাশ টাকা।

যোগাযোগ

জিতেন নন্দী, বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর, বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮

দূরভাষ : ০৩৩-২৪৯১৩৬৬৬, ই-মেল : manthansamayiki@gmail.com

পাবলিক লাইব্রেরি, ছোটো পত্রিকা এবং সাম্প্রতিক সরকারি নির্দেশনামা

১০ এপ্রিল বিকেল ৫টায় পাবলিক লাইব্রেরির কয়েকজন গ্রন্থাগারিক (বর্তমান ও অবসরপ্রাপ্ত), ৯টি পত্রিকার সম্পাদক ও কর্মীবৃন্দ এবং অন্যদের উপস্থিতিতে এক আলোচনাসভা হয় কলকাতায় কলেজ স্ট্রিটের র‍্যাডিকাল হিউম্যানিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাগৃহে। আলোচনার বিষয় ছিল, পাবলিক লাইব্রেরি, ছোটো পত্রিকা এবং সাম্প্রতিক সরকারি নির্দেশনামা। সভায় গ্রন্থাগার এবং লিট্‌ল ম্যাগাজিন ও ছোটো সংবাদপত্রের দৃষ্টি থেকে সরকারি নির্দেশনামার তাৎপর্য নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা হয়। আলোচনাটি কয়েকটি শিরোনামে ভাগ করে পেশ করা হল।

নির্দেশনামাটা কী হয়েছে?

বিমল সেন : জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা দপ্তর থেকে এই অর্ডারটা বেরিয়েছে ১৪ মার্চ। এতে বলা আছে অর্ডারটা কার্যকর হচ্ছে সরকারি লাইব্রেরি, সরকার পোষিত লাইব্রেরি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত লাইব্রেরিতে, যেগুলো পাবলিক সার্ভিস দেয়। তাদের ক্ষেত্রে এটা বলা হয়েছে, গভর্নমেন্ট ফান্ড যেটা খরচ করা হয়, সংবাদপত্র/দৈনিক যা যা কেনা হয়, কোনো রাজনৈতিক দলের দ্বারা প্রকাশিত এবং/অথবা কোনো রাজনৈতিক দলের দ্বারা প্রকাশিত বলে মনে হচ্ছে এরকম সংবাদপত্র/দৈনিক পত্রিকা এগুলো গভর্নমেন্ট ফান্ড ব্যবহার করে কেনা যাবে না। এই উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় যেটা বলেছে এখানে, আটটি সংবাদপত্রের নাম দেওয়া হয়েছে — সংবাদ প্রতিদিন, সকালবেলা, খবর ৩৬৫ দিন, একদিন, দৈনিক স্টেটসম্যান, সন্মার্গ, আখবার-ই-মশরিক এবং আজাদ হিন্দ; পরে আরও ৫টি নাম যুক্ত হয়, দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, আজকাল, হিমালয় দর্পণ, সারসাগুন এবং কলম। এখানে উল্লেখযোগ্য, এই অর্ডার যখন হচ্ছে, তখনও 'কলম' প্রকাশিত হয়নি। এইবার এই দ্বিতীয় অর্ডারে বলা হয়েছে, 'পাবলিক লাইব্রেরি পাঠকদের চাহিদার ভিত্তিতে এই সরকারি অর্ডারের তালিকাভুক্ত সংবাদপত্রগুলির মধ্য থেকেই কেবল সংবাদপত্র কিনবে'।

'হিমালয় দর্পন' নেপালি কাগজ বেরোয় দার্জিলিং থেকে।

বেনজির আহমেদ : সারদা গোষ্ঠীর। এই তালিকার মধ্যে সারদা গোষ্ঠীরই চারটে কাগজ আছে।

গৌতম গাঙ্গুলি : স্পনসর্ড বা সরকার পোষিত লাইব্রেরি কীরকম?

বিমল সেন : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে মাস এডুকেশন এক্সটেনশন অ্যান্ড লাইব্রেরি সার্ভিসেস বলে একটা দপ্তর আছে। ডাইরেক্টরেট অব লাইব্রেরি সার্ভিসেস-এর অধীনে ১২টা গভর্নমেন্ট লাইব্রেরি আছে। এর মধ্যে স্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরি কলকাতা, কলকাতা মেট্রোপলিটন লাইব্রেরি, উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরি, উত্তরবঙ্গের কোচবিহার স্টেট লাইব্রেরি, টাকি ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরি, বারাসাত গভর্নমেন্ট ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরি, দেশবন্ধু লাইব্রেরি দার্জিলিং, সিধু-কানু টাউন লাইব্রেরি পুরুলিয়া, দীঘা টাউন লাইব্রেরি মেদিনীপুর, সেন্ট্রাল লাইব্রেরি বাণীপুর, আরও দু-একটা লাইব্রেরি আছে। এদের পরিচালনাটা হচ্ছে সরাসরি ডাইরেক্টরেট অব লাইব্রেরি সার্ভিসেসের অধীনে।

গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড লাইব্রেরির ক্ষেত্রে, একটা পাবলিক লাইব্রেরি অ্যাক্ট আছে, এই আইন পাশ হয়েছিল ১৯৭৯ সালে, তারপর তার কিছু সংশোধন হয়। এই আইনের অধীনে ২৪৭২টা লাইব্রেরি আছে। এদের কর্মচারীদের বেতন সরকার গ্রান্টিং এইড থেকে দেয়। এদের একটা রেকারিং ফান্ড সরকার দেয় বই ও পিরিওডিকাল্‌স কেনার খাতে, এছাড়া ফার্নিচার্স, বাইন্ডিং, প্রিজারভেশন ইত্যাদির জন্য। এগুলি সব সরকার পোষিত লাইব্রেরি। এদের ক্ষেত্রে পরিচালন ব্যবস্থাটা হল, এই আইনের অধীনে একটা নির্বাচন হয়। নির্বাচনের মাধ্যমে একটা পরিচালন সমিতি তৈরি হয়।

স্পনসর্ড লাইব্রেরিরও তিনটে ক্যাটেগরি আছে। এক, ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরি; দুই, টাউন বা সাবডিভিসন লাইব্রেরি এবং তিন, রুরাল বা প্রাইমারি ইউনিট। স্টাফ-স্ট্রাকচারটা হল, রুরাল বা প্রাইমারি ইউনিটে দুজন থাকবে, একজন প্রফেশনাল এবং একজন নন-প্রফেশনাল। টাউন বা সাবডিভিশনাল লাইব্রেরিতে চারজন, দুজন প্রফেশনাল এবং দুজন নন-প্রফেশনাল। ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরিতে তিনজন প্রফেশনাল — একজন লাইব্রেরিয়ান ও দুজন অ্যাসিস্টেন্ট লাইব্রেরিয়ান এবং বাকি সাতজন নন-প্রফেশনাল। এরা সরকার অনুমোদিত স্কেলে মাইনে পায়।

গভর্নমেন্ট এইডেড লাইব্রেরি হল, যাদের কিছু স্পেশাল সার্ভিসেস আছে, তাদের এককালীন কিছু গ্রান্ট দেয়, স্টাফ-স্যালারিটাও দেয়। কিন্তু এদের পরিচালন ব্যবস্থা ওই আইনের মধ্যে নেই। এদের মধ্যে যেমন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ আছে, কৃত্তিবাস মেমোরিয়াল লাইব্রেরি ফুলিয়া আছে, রামকৃষ্ণ মিশনের অধীনে দু-একটা লাইব্রেরি আছে। এদের পরিচালন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হল, এদের একটা অ্যাডভাইসরি বডি থাকে। তারাই পরিচালনাটা করে। কিন্তু কোনো নির্বাচন হয় না। সাতটা এইডেড লাইব্রেরি আছে, একটা নিয়ে কিছু বিরোধ আছে। এতে রিক্রুটমেন্টের একটা গাইডলাইন থাকে বটে, কিন্তু সবটাই স্বশাসিত।

এর বাইরে একটা ক্যাটেগরি আছে, সেটা হল, সরকারের অপোষিত বেসরকারি লাইব্রেরি, নন-গভর্নমেন্ট নন-স্পনসর্ড লাইব্রেরি। এই লাইব্রেরিগুলো সাধারণত এলাকার মানুষ দ্বারা পরিচালিত। এগুলোতেও গভর্নমেন্ট এখন একটা গ্রান্ট দেয়। সরকার একটা বিজ্ঞাপন দেয়, তার ওপর আবেদনের ভিত্তিতে এবং কতকগুলো শর্ত পূরণ করলে এই গ্রান্ট মঞ্জুর হয়।

নির্দেশনামার তাৎপর্যটা কী?

নির্দেশনামার তাৎপর্যটা কী? এতদিনকার অভ্যাস বা রীতি কী ছিল? সেদিক থেকে আলোচনাটা করলে ভালো হয়।

সত্যব্রত ঘোষাল : লাইব্রেরিতে পত্রিকা কী কেনা হবে, তার ওপর এই ধরনের হস্তক্ষেপ কোনোদিন ছিল না। তবে একটা ব্যাপার ছিল, আগের সরকার বা কংগ্রেস সরকারের আমলেও, ২৬টা সংবাদপত্রের কথা তারা বলেছিল, তোমরা এর ভিতর থেকে কিনে নাও। স্কেলটা বেশি ছিল বলে আমরা বিষয়টা নিয়ে ভাবিনি। কিন্তু এই অর্ডারটা বেরোনোর পরে কতকগুলো ঘটনা পরপর ঘটে গেছে। যাঁরা কাগজের ব্যবসা করেন, তাঁরা যেটা বলছেন, আমাদের বক্তব্য সেটা নয়। আমাদের একটাই বক্তব্য, একটা সাধারণ গ্রন্থাগার হচ্ছে এমন এক জায়গা, out of school education for the life, একজন মানুষ সারা জীবন যেখানে পড়াশুনো করতে পারে। সেখানে যদি আমরা

কোনো বাধানিষেধ তৈরি করি, এটা পড়বে এটা পড়বে না, তাহলে তার পড়ার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হবে। একটা ঘটনা আমি বলব। অস্ট্রেলিয়ার ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে ১৯৯৬ সালে একটা ঘটনা ঘটেছিল। সেখানকার যিনি লাইব্রেরিয়ান, তিনি বিভিন্ন বিষয়ে বই কিনতেন। স্বাভাবিকভাবে 'টেররিজম ইজ এ গ্লোবাল ফ্যাক্টর'–এর ওপরেও কিছু বই কিনেছিলেন। বই কেনার পরে ওখানে কিছু কিছু আপসার্জ ঘটতে থাকল। সেই ঘটনায় যে ছাত্রেরা যুক্ত ছিল, তাদের যখন ইন্টারভিউ করা হল, তারা বলল, আমরা এই তথ্যগুলো জেনেছি ওই লাইব্রেরিতে বইগুলো পড়ে। সেই বইগুলো লাইব্রেরিয়ান সবার নাগালের মধ্যে (accessible) রেখে দিয়েছিলেন। এরপরে অস্ট্রেলিয়ান গভর্নমেন্ট তাঁকে গ্রেপ্তার করল। তিনি জেলে গেলেন। তখন অস্ট্রেলিয়ান লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন দেখল, ব্যাপারটা যখন এরকম জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, তারা রাষ্ট্রসংঘের কাছে হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করে। রাষ্ট্রসংঘ হস্তক্ষেপ করে রাইট টু ফ্রিডমের ধারণা থেকে বলে, তাঁকে গ্রেপ্তার করে অস্ট্রেলিয়ান গভর্নমেন্ট ঠিক করেনি। কারণ এই সূর্যের তলায় যা যা মত আছে, তা গ্রহণ করবে কিনা, প্রয়োগ করবে কিনা সেটা আলাদা প্রশ্ন, কিন্তু তা প্রত্যেক মানুষের জানার অধিকার আছে। এর তিন সপ্তাহ পরে তাঁকে বেকসুর মুক্তি দেওয়া হয় এবং গভর্নমেন্ট ক্ষমা প্রার্থনা করে। এটা একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। আমাদের এখানে এরকম নজির আমরা পাইনি।

এই যে একটা নির্দেশনামা দেওয়া হল সরকারের পক্ষ থেকে, তাতে দুটো জিনিস দাঁড়াচ্ছে — আমরা কোন জিনিসটা পড়ব বা পড়ব না (পরবর্তীকালে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, কী পড়বেন আর কী পড়বেন না, সেটা এখনও বলিনি, পরে বলব), আমার গ্রন্থাগারে আর্থিক সংকট আছে, আমি খরচা করতে পারছি না, তাই বই বা পত্রিকা কিনতে পারছি না বটে, কিন্তু একটা স্বাধীনতা আমার থাকছে আমি কী কিনব কী কিনব না। কিন্তু যদি বলা হয়, আপনার আর্থিক অবস্থা যাই হোক না কেন, কী কিনবেন সেটা আমি ঠিক করে দেব, তাহলে এটা সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মূল যে সূত্র, সব মানুষ একসাথে যে কোনো জায়গায় যে কোনো বই পড়তে পারবে, সেই দর্শনের বিরোধী হয়ে দাঁড়াল। এখন আমরা এই ঘটনাকে দুটো ভাগে ভাগ করব। এই যে নির্দেশটা এবং তা আমার বেসিক যে ভিত্তি সেখানে হস্তক্ষেপ করছে। এই ঘটনার ঐতিহাসিক দিকগুলো কী? এটা কেন সরকার করল? এই নির্দেশনামার ফলে যদি বড়ো বড়ো পত্রিকাগোষ্ঠীর তিন হাজার কাগজ বিক্রি কমে যায়, তাহলে তাদের কিন্তু কোনো ক্ষতি হয় না। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে এটাই, আমরা এটা মেনে নেব কি নেব না। মেনে নেওয়ার বিরোধিতা হচ্ছে, কারণ এতে আমাদের পড়ার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। যেমন ধরুন একটা ঘটনা, কিছুদিন আগে এই পশ্চিমবঙ্গে 'দ্বিখণ্ডিত' বলে একটা বইকে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হল। বইটা নিষিদ্ধ হয়েছিল প্রকাশনার অনেক পরে। ওই বইটা যখন লাইব্রেরির মধ্যে ঢুকবে, তখন লাইব্রেরিয়ান কী করবেন? বলতেই পারেন, যেহেতু সরকার নিষিদ্ধ করে দিয়েছে, সুতরাং ওটা পড়তে দেব না। কিন্তু যে মুহূর্তে একটা সাধারণ গ্রন্থাগারের দ্বারা বইটা সংরক্ষিত থাকছে, সত্যিই কি সে বলতে পারে, কোন বই দেব কোন বই দেব না? একটা কথা বলতে পারে, বইয়ের যে অবস্থা আমি ওইভাবে পড়তে দিতে পারছি না। কিংবা সে বলতে পারে, যেহেতু নিষিদ্ধ হয়েছে, আমি ওই বইটা লেন্ডিংয়ে দিতে পারছি না। কারণ, ষাটের দশক বা সত্তরের দশকে মাও সে তুঙের বইপত্র কিছু কিছু নিষিদ্ধ হয়েছিল। তখন কিন্তু আমাদের বড়ো বড়ো লাইব্রেরিতে এমন কোনো নির্দেশ ছিল না যে আমরা ওই বইটা পড়তে দেব না। বলা হয়েছিল, আমরা ওই বইটা লেন্ডিংয়ে দেব না। লেন্ডিংয়ে না দেওয়ার যুক্তি হচ্ছে, যদি বইটা হারিয়ে যায় আমি ওই বইয়ের আর একটা কপি জোগাড় করতে পারব না। যেহেতু সরকার ওই বইটা নিষিদ্ধ করেছে, আমি ওটা লাইব্রেরির মধ্যে পড়ার সুযোগটা দিতে পারি।

এখন এই নিয়মটার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এটাই, সরকার যে নির্দেশনামা দিলেন, তাতে এই যে কাগজগুলো বন্ধ হয়ে গেল, এটা কি প্রথম শর্ত? পরের শর্ত কি এরকম আসবে, কী বই পড়া হবে, কোন কাগজ থাকবে তা ওদের দ্বারা নির্দেশিত হবে? এটাই হচ্ছে আমাদের বর্তমান সমস্যা। আমরা আনন্দবাজার চাই, এটা আমাদের বক্তব্য নয়। আমাদের বক্তব্য হবে এটাই, আমাদের স্বাধীন পড়ার অধিকারে হস্তক্ষেপ করা চলবে না।

গত বইমেলায় একটা কথা বলা হয়েছিল, যেসব পত্রিকার রেজিস্ট্রেশন নম্বর নেই, তাদের মেলায় বসতে দেওয়া হবে না। এটাও কিন্তু একটা অত্যন্ত ... ফ্যাসিস্ট বলাটা অন্যায় নয়। যদি বলা হয়, যে প্রথমে আসবে সে অগ্রাধিকার পাবে, ঠিক আছে। এরপরে হয়তো আসবে, যে কাগজগুলোর রেজিস্ট্রেশন নেই, সেগুলো আমি বিক্রিই করতে দেব না।

লাইব্রেরিতে যে কমিটি আছে, তারা আমার রাজনীতির পন্থী, অতএব আমার রাজনীতির যতগুলো কাগজ আছে সেগুলোই লাইব্রেরিতে থাকবে, সেটাও কিন্তু অন্যায়। যদি আপনি এরকম একটা সিদ্ধান্ত নেন, আমাদের লাইব্রেরিতে সমস্ত কাগজই রাখব, যদি মনে হয় জিতেনবাবুর বাবা আমাদের দুটো কাগজ গিফ্‌ট করবেন, আমি সে দুটো রাখব এবং সেই টাকাটা দিয়ে আমি অন্য পত্রিকা কিনব।

সৌজন্য সংখ্যাও রাখা যাবে না, এটা একটা কাগজে বেরিয়েছে মন্ত্রীর বক্তব্য হিসেবে। এটা নির্দেশনামায় নেই।

আমি একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলাম। আমি যখন সেখানে জয়েন করেছিলাম ২০০৩ সালে, তখন সেখানে ২৭টা 'গণশক্তি' আর ২১টা 'আজকাল' রাখা হত। অন্য কোনো কাগজ রাখা হত না। এর বিরোধিতা হয়েছে। এগুলো ফ্রি ফান্ডিং করা হত। পরে ১টা করে রাখা হত। আমরা প্রতিদিন ১৯টা কাগজ রাখতাম লাইব্রেরিতে এবং সেগুলো সংরক্ষণ করা হত।

বিমল সেন : আমার যেটা বারবার মনে হচ্ছে, এই পুরো অর্ডারটার সঙ্গে সঙ্গে পাবলিক লাইব্রেরিতে কয়েকটা সংকট দেখা দিচ্ছে। যেটা ভাবার দরকার আছে, purchase should be restricted to বলে এটা করা হল এবং কতকগুলো নিউজপেপারের নাম দিয়ে দেওয়া হল। তারপরে যে আলোচনাগুলো হচ্ছে, পাবলিক লাইব্রেরির যে স্পিরিটটা নষ্ট হচ্ছে, সারা পৃথিবী জুড়ে পাবলিক লাইব্রেরির যে প্রাথমিক ধারণা, access for all, open to all এবং ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ্ লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশনের যে গাইডটা আছে, তাতে বলা হয়েছে, গ্রন্থাগার সকলের ব্যবহারের উপযোগী হবে সবদিক থেকে। গ্রন্থাগারের বিল্ডিংটা এমন জায়গায় হবে যাতে সকলে যেতে পারে। গ্রন্থাগার এমন সময় থেকে এমন সময় পর্যন্ত খোলা থাকবে যাতে সব মানুষ যেতে পারে। আমি দশটা থেকে পাঁচটা খুলে

রাখলাম। যে লোকটি সরকারি চাকরি করে, সে লাইব্রেরিটা ব্যবহার করতে পারল না। এটাও পাবলিক লাইব্রেরির স্পিরিটের বিরোধী। ঠিক একই জায়গা থেকে ওঁরা বলছেন, কালেকশন ডেভেলপমেন্টের যে নীতি হবে, একটা লাইব্রেরিতে আমি যে বই, পত্রপত্রিকা রিসোর্সটা সংগ্রহ করব, সেই সংগ্রহটারও নীতি হবে access for all অর্থাৎ রিডার্স/ইউজার্স ডিমান্ড অনুযায়ী। সাম্প্রতিক অর্ডার একটা লাইব্রেরিতে পাঠকের চাহিদার ওপরে হস্তক্ষেপ করছে। আমাদের প্রতিবাদের অভিমুখ হওয়া উচিত এই জায়গায়। যেটা হচ্ছে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ, গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ, ইত্যাদি ইত্যাদি সংবাদপত্রের দিক থেকে। আক্ষরিক অর্থে বা আইনগতভাবে ঘটনা কিন্তু তা নয়, সংবাদপত্র নিষিদ্ধ হয়নি বা খবর ছাপার ওপর কোনো নিষেধাজ্ঞা জারি হয়নি। এই অর্ডারে পাবলিক লাইব্রেরিতে পাঠকের যে চয়েসের অধিকার ছিল সেটা খর্বিত হয়েছে। এটা প্রথম পয়েন্ট।

দ্বিতীয় পয়েন্ট হল, পাবলিক লাইব্রেরিতে যারা কাজকর্ম করে, তাদের কাছ থেকে যে পরিসংখ্যান পাচ্ছি, লাইব্রেরিতে যারা যায় তাদের ৮০ শতাংশ খবরের কাগজটা দেখে। এটা ঘটনা, এই অর্ডারের পর থেকে যেসব লাইব্রেরিতে এটা কার্যকর করা হয়েছে, সেখানে এই পাঠকসংখ্যাটা কমে গেছে। এই পাবলিক লাইব্রেরি নিয়ে সরকারের কী চিন্তাভাবনা আছে, সেটা আমরা জানি না। কিন্তু এটা ঘটনা, পাবলিক লাইব্রেরির পারফর্মেন্স বলুন, গত ২০–৩০ বছর ধরে পাবলিক লাইব্রেরি যে সার্ভিসটা দিয়েছে, সেটা সেইভাবে সমাজে স্বীকৃত নয়। ফলে পাবলিক লাইব্রেরি যে একটা শক্ত ফুটিংয়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, তা নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার যে একটা অন্তর্নিহিত ক্ষমতা আছে, সেটা বোঝা যাচ্ছে প্রতিবাদের ধরনটা দেখে। একটা বক্তব্য এসেছে, একটা ছোট্ট দপ্তরের ছোট্ট অর্ডার নিয়ে এত জল ঘোলা করার কী আছে? অর্ডারটা খুব ছোট্ট দপ্তরের ছোট্ট কিছু হয়নি। কারণ পাবলিক লাইব্রেরির পরিচালন সমিতিতে যাঁরা যুক্ত আছেন, তাঁরাও বুঝতে পারছেন সমস্যাটা কোথায়।

এই অর্ডার দুটো কাজ করেছে। এক, পাবলিক লাইব্রেরির স্পিরিটের ওপর ধাক্কা মেরেছে; দ্বিতীয়, পাঠকের চয়েসের ওপর হস্তক্ষেপ করেছে। প্রতিবাদের অভিমুখ এদিক থেকেই হওয়া দরকার বলে আমার মনে হয়েছে।

এই আদেশনামার পিছনে চারটে যুক্তি ছিল। একটা ছিল, বাজেট। বাজেট কম, তাই আমরা নিউজপেপার কেনার জায়গাটা একটু সংকুচিত করলাম। বাজেট কম এটা লিখিতভাবে আসেনি। কিন্তু সাক্ষাৎকারে এসেছে। এ প্রসঙ্গে আপনাদের বলে রাখি, সরকার যে গ্রান্ট দেয়, সেখানে গ্রান্টের হেডিংটা হচ্ছে, গ্রান্ট ফর বুক্স অ্যান্ড পিরিওডিকাল্স। এর মধ্যে কত টাকার বই আর কত টাকার পিরিওডিকাল্স/নিউজপেপার, সেটার উল্লেখ নেই। একটা টাউন লাইব্রেরিতে ৬০,০০০ টাকা, একটা ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরিতে ২৫,০০০ টাকা এবং একটা রুরাল লাইব্রেরিতে ১৫,০০০ টাকার বুক্স অ্যান্ড পিরিওডিকাল্স বাজেট। তাহলে কোনো লাইব্রেরি যদি মনে করে সে ৪০,০০০ টাকার বুক্স অ্যান্ড পিরিওডিকাল্স কিনবে, কিনতে পারে। তাহলে বাজেটের বিষয়টা এই অর্ডার থেকে দাঁড়াচ্ছে না, যে, আমাদের বাজেটটা কম তাই আমরা বেঁধে দিলাম। তাহলে সরকারকে নির্দিষ্ট করতে হবে, তুমি এত টাকার বই কিনবে, এত টাকার পিরিওডিকাল্স কিনবে আর এত টাকার নিউজপেপার কিনবে। দ্বিতীয় কথা হল, ছোটো কাগজকে গুরুত্ব দেওয়া। এটাও অর্ডারে নেই, সাক্ষাৎকারে এসেছে। ছোটো কাগজগুলোর প্রসঙ্গে এসে গেছে, তাদের সঙ্গে কোন কোন ফাইনান্সার গ্রুপ জড়িত এবং সেগুলো খুব ছোটো নয়। দুটো জায়গায় অর্ডারের মধ্যে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, একটা হল, মুক্তচিন্তার কথা পরিষ্কার বলা হয়েছে এবং সরকার মনে করছে এই কাগজগুলো মুক্তচিন্তার পক্ষে রয়েছে। অর্ডারে লেখা রয়েছে, 'জনস্বার্থে এটা জরুরি বলে মনে হয়েছে, কোনো পাবলিক লাইব্রেরিতে পাঠকদের মধ্যে মুক্তচিন্তার প্রসার ঘটানোর জন্য কোনো জাতীয় বা আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের দ্বারা প্রকাশিত এবং/অথবা কোনো রাজনৈতিক দলের দ্বারা প্রকাশিত বলে মনে হচ্ছে এরকম সংবাদপত্র/দৈনিক পত্রিকা কেনার জন্য কোনো সরকারি অর্থ খরচ করা হবে না।' এখানে প্রথম অর্ডারটাতে মনে হচ্ছিল, আমাদের এই আটটাই রাখতে হবে। পরের অর্ডারটাতে বলা হয়েছে, রিডার্স ডিমান্ডকে রেস্ট্রিক্ট করতে হবে এই ১৩টার মধ্যে। এই জায়গাটা গুরুত্বপূর্ণ যে আমি ইচ্ছা থাকলেও এর বাইরে সংবাদপত্র পড়তে পারব না।

এখন নিউজপেপারের সংজ্ঞাটা কী? প্রেস অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন অফ্ বুক্স অ্যাক্ট–এর সংজ্ঞা অনুসারে, সমস্ত পত্রিকা যার পিরিওডিসিটি ৩০ দিনের কম এবং যাতে নিউজ ও ভিউজ অফ্ নিউজ আছে, যার একটা বোনাফাইড লিস্ট অফ্ সাবস্ক্রাইবার্স আছে, সেটাই হল নিউজপেপার। তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে? আমি দৈনিক পত্রিকার কথা বাদ দিলাম। রেজিস্ট্রার অফ্ নিউজপেপারের অধীনে পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত রেজিস্টার্ড পত্রিকার সংখ্যা ৭৪৫৭। প্রেস অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন অব বুক্স অ্যাক্ট–এ দুটো জায়গায় নিউজপেপারকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। একটা হচ্ছে, গভর্নমেন্ট অফ্ ইন্ডিয়ার মিনিস্ট্রি অব কম্যুনিকেশন অ্যান্ড আইটি, তাদের অধীনে একটা সংজ্ঞা আছে, পোস্টেজ চার্জ কত হবে সেজন্য তারা করেছিল। আরেকটা হচ্ছে, প্রেস অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন অব বুক্স অ্যাক্ট–এ। প্রেস অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন অফ্ বুক্স অ্যাক্ট–এ এই পিরিওডিসিটি ব্যাপারটাকেও বলতে চাইছে না। তারা বলছে, যে কোনো সময়ের ব্যবধানে বেরোলেই সেটা নিউজপেপার হবে। যদি তার মধ্যে নিউজ ও ভিউজ অফ্ নিউজ থাকে। সেই অর্থে এই ৭৪৫৭ রেজিস্টার্ড, সঙ্গে আনরেজিস্টার্ড পত্রিকাও আছে, সবটা ধরে নিয়ে যে পত্রিকাগুলো থাকল, পিরিওডিকাল্স জার্নাল সব মিলিয়ে, তার মধ্যে কি আমি এই ১৩টাকে মেনে নেব? এর মধ্যে 'কলম' ও 'খবর ৩৬৫ দিন' এখনও রেজিস্ট্রেশন পায়নি। অর্ডারে আছে নিউজপেপার/ডেলিজ। অতএব আমি আমার লাইব্রেরিতে যে ৪০টা পত্রপত্রিকা নিই সেগুলো বন্ধ করে দিলাম।

সত্যব্রত ঘোষাল : তাহলে একটা ভুল অর্ডারকে ডিফেন্ড করতে গিয়ে আরও অনেক ভুল করা হচ্ছে। সুখেন্দুবাবু এমপি তিন–চারদিন আগে বলেছেন, খবরের কাগজ আর কেউ লাইব্রেরিতে গিয়ে পড়ে না, এখন ই–জার্নালের যুগ। এই কথা তিনি বলছেন ২০১২ সালে দিল্লিতে বসে। তাহলে মাটি কি রইল? মা রইল কিনা আমি জানি না, মানুষ তো থাকছে না।

বিমল সেন : আরও একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার রয়েছে। ডোনেশন নেওয়া যাবে কি? এই একটা প্রশ্ন এসেছে। খুব সম্প্রতি সরকার আর

একটা অর্ডার করেছে, ১৯ এপ্রিল ২০১১। খুবই দুর্ভাগ্যের, এটা বলতে খারাপ লাগছে, ১৯৮৯ সালের পাবলিক লাইব্রেরি অ্যাক্ট তৈরি হলে, বেসিক অবজেক্টিভ অ্যান্ড ফাংশন্‌স অফ্‌ পাবলিক লাইব্রেরি কী হবে, বিভিন্ন ক্যাটেগরির যে লাইব্রেরি আছে, সেখানে এটা বলা হয়নি। ওই অর্ডারে আমরা পেলাম, পাবলিক লাইব্রেরির কী কী ফাংশন হবে। সেখানে প্রথম বলা আছে, যে কোনো লাইব্রেরি তার ডকুমেন্ট প্রকিওর করতে পারে তিনটে পদ্ধতিতে। এক, সে কিনতে পারে; দুই, অন্য কোনো লাইব্রেরির সঙ্গে বিনিময় করতে পারে এবং তিন, গিফ্‌ট হিসেবে নিতে পারে। তাহলে এই প্রশ্নটা ওঠেই না, আপনি গিফ্‌ট নিতে পারবেন না। এই সরকারের অর্ডারই এই কথাটা বলছে।

আর একটা ইন্টারেস্টিং জায়গা বাজেটের প্রশ্নে। অনেকের ধারণা, লাইব্রেরিতে ৪টে করে নিউজপেপার নেওয়া হয়। ২০০২ সালের একটা অর্ডার আছে, সেখানে সরকারি লাইব্রেরিগুলো, ১২টা লাইব্রেরি, কে কতগুলো নিউজপেপার ও পিরিওডিকাল্‌স কিনতে পারে, তার একটা তালিকা আছে। সেখানে স্টেট লাইব্রেরি ২০টা কিনতে পারে, উত্তরপাড়া লাইব্রেরি ১৫টা করে, ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরিগুলো ১০টা করে এবং বাকিগুলো ৫টা করে। সুতরাং ৪টে নিউজপেপার কিনত, এটাও ঠিক নয়।

সরকারি আদেশনামাগুলোর মধ্যেই এই অসঙ্গতিগুলো রয়েছে। তার ফলে এখনকার অর্ডারকে সরকার কতখানি ডিফেন্ড করতে পারবে আমি জানি না। কিন্তু এই অর্ডার পাবলিক লাইব্রেরির স্পিরিটের ওপর ধাক্কা মেরেছে এবং পাঠকের চয়েসের ওপর হস্তক্ষেপ করেছে। তারা কেন লাইব্রেরিতে আসবে? এর ফলশ্রুতিতে আগামীদিনে দাঁড়াবে, পাবলিক লাইব্রেরি বন্ধ করে দাও।

পাঠকরা কী বলছে?

বিমল সেন : পাঠক তো সঙ্গে সঙ্গেই ডেপুটেশন দিয়েছে। যেদিন অর্ডার দিয়ে কাগজ বন্ধ হয়েছে, সেদিনই তারা ডেপুটেশন দিয়েছে।

ধরা যাক, সরকার স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে একটা হেলথ স্কিম নিল। সরকার কি বলতে পারে, আমি হরলিকস কিনব? কিংবা আমি কমপ্ল্যান কিনব? ৭৪৫৭টা কমপিটিটিভ প্রোডাক্ট, প্রত্যেকে পয়সা দিয়ে কাগজ বেচে। আপনি কী করে ১৩টার নাম বলেন? এটা তো ব্র্যান্ড নেম বলে দেওয়া। জেনেরিক নেম বলতে পারে। কিংবা প্রোডাক্টের নাম বললেও তার ইকুইভ্যালেন্টও ব্যবহার হতে পারে, সেটা বলতে হবে।

ছোটো পত্রিকায় বিজ্ঞাপন বন্ধের বিষয়টা কী?

বিমল সেন : জেলাতে একটা অর্ডার এসেছে তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক দপ্তর থেকে। পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত তালিকাভুক্ত পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া বন্ধ থাকবে।

পত্র-পত্রিকার দিক থেকে নির্দেশনামার প্রভাব

দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় : আমরা কি পত্রিকার শিকার? পত্রিকা যদি বিষয়টাকে আনে, তখনই কি আমরা চেঁচাব? আনন্দবাজার যদি না লিখত,তাহলে আমরা এই নির্দেশনামার কথা জানতেই পারতাম না। উনি যে বলছেন, ২৭টা 'গণশক্তি' আর ২১টা 'আজকাল' রাখা হত, কোন অর্ডারের ভিত্তিতে রাখা হত? সরকার কোনো প্রোডাক্টের নাম বলে দিতে পারে না? তাহলে ২৭টা 'গণশক্তি' আর ২১টা 'আজকাল' কোন অর্ডারের ভিত্তিতে নেওয়া হল? একটা সিদ্ধান্ত তো অন্তত হয়েছে। আমার বক্তব্য হল, আমরা যদি সচেতনই হই, আগে কেন হলাম না? হই নি। তাহলে আমরা আনন্দবাজারের ওপর নির্ভরশীল। আমি খুব বিভ্রান্ত হয়ে তর্কটা করছি। আমাদের খামতিটা তাহলে কোথায়? সব জায়গায় গণশক্তি পাঠানোর ফলে সব জায়গায় আনন্দবাজারের চাহিদা বেড়েছে। লাইব্রেরিতে সবাই আনন্দবাজার পড়তে যেত। গণশক্তিকে আমরা সাহায্য করতাম।

সত্যব্রত ঘোষাল : আর একটা ব্যাপার এখানে আছে। প্রত্যেকটা সরকারি আদেশ গণশক্তিতেই বেরোত।

দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় : সেটাও তাহলে ঠিক ছিল না। সমস্ত কাগজেই দেওয়া উচিত ছিল। আমি একটা পাবলিক লাইব্রেরিতে সেক্রেটারি ছিলাম। ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরি লেভেলের পরে কিছু টাউন লাইব্রেরি ছাড়া কোনো কাজ ছিল না লাইব্রেরির। আমাদের লাইব্রেরিটা ছিল সকালবেলা দশটা থেকে একটা। সন্ধ্যাবেলায় চারটে থেকে সাতটা খোলা থাকত। রবিবার খোলা থাকত। কারণ ওইদিন লোকজন আসত। সরকারি সিদ্ধান্ত হল, রবিবার ছুটি, অন্যদিন দশটা থেকে পাঁচটা খোলা। আমার লাইব্রেরির দুটো স্টাফ ছিল। লাইব্রেরিয়ান ট্রান্সফার নিয়ে চলে গেল। আমি যখন তাঁকে বললাম, হবে না, আমার লোক লাগবে, আমাকে ধমকাচ্ছেন। জোর করে লাইব্রেরিয়ানকে ধরে নিয়ে চলে গেলেন। আর একজন স্টাফ রিটায়ার করে চলে গেল। লাইব্রেরি অফিসারের কথা হল, লাইব্রেরি বন্ধ করে দিন। এবার একজন লাইব্রেরিয়ানকে পাঠানো হল, সপ্তাহে তিনদিনের জন্য, তিনি মাইনে নেবেন অন্য লাইব্রেরি থেকে। সপ্তাহে তিনি একদিন আসতেন বা আসতেন না। তখন আমাদের মেলা থেকে বই কেনার জন্য বলা হল। ৮০% ওখান থেকে কিনুন, টাকা দিচ্ছি, লিস্ট ধরিয়ে দেওয়া হল। তাহলে কোথায় আমার চয়েস। চয়েস তো সরকার করে দিচ্ছে। ২০% থাকছে অন্য খাতে। তখন তো বলা হয়নি আপনি পাঠকের মতামত নিয়ে কিনুন। আজ কে নাচাচ্ছে আমাদের?

আমি ছোটোবেলা থেকে রাজনীতির লোক। কিন্তু সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত। ধরুন মার্ক্স-এঙ্গেল্‌স ইত্যাদিদের নাম করে দীর্ঘদিন একটা কিছু চলল। কিন্তু সমস্ত কাজকর্মগুলো অ্যান্টি মার্ক্স। আমিও তো মার্ক্সের ছাত্র। একটা দ্বিধায় পড়ে গেলাম। এখন যা কিছু করো সিপিএম বিরোধিতা করো, সিপিএম বিরোধিতা করতে গিয়ে ... কোনো বেসিক জায়গায় বিরোধিতা নেই।

শিকার হয়ে যাচ্ছি আমরা। যখন আনন্দবাজার প্রশ্নটা তুলে দিচ্ছে, তখন মনে হচ্ছে আমরাও ওদেরই অংশ। আমায় বিজ্ঞাপন সরকার দেবে কি দেবে না, তার ওপর কি আমার পত্রিকা বার করা নির্ভর করে? সরকার না দিলে বরং আমার পত্রিকা ভালো চলবে। আমি আমার মতো করে কাগজটা করতে পারব। কিন্তু তার মানে এই নয়, সবাই যখন পাচ্ছে আমি পাব না কেন? সেটা আর একটা প্রশ্ন। আমি যেদিন কাগজটা শুরু করেছিলাম, বিজ্ঞাপন পাব বলে করিনি।

অসিত রায় : বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বছর এগারো-বারো আগে বলেছিলেন, ফ্রন্টিয়ার আমাদের বিরুদ্ধে লেখে, ওদের বিজ্ঞাপন ইত্যাদি বন্ধ করে দাও। তখন ব্যক্তিগত স্তরে মহাশ্বেতা দেবী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে বললেন, তখনও সম্পর্কটা ভালো ছিল ওঁদের, সমর সেনের কাগজ, কেন আপনি এটা করবেন? এরকম অনেক কিছুই ঘটে।

দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় : আমি যেটা বলতে চাইছি, দৃষ্টিভঙ্গিটা দেখার

দরকার আছে ভিতর থেকে। লাইব্রেরিটাকেই ধরল কেন? ধরুন, ছোটো ছোটো কাগজের জন্য বিজ্ঞাপনের কথা উঠেছে, বিজ্ঞাপনের জন্যই কাগজ তৈরি হচ্ছে। বিজ্ঞাপন পাবে নিশ্চিত হয়ে কাগজ বার করতে যাচ্ছে। এখানে তফাত আছে মানসিকতার। অকার্যকর একটা ব্যবস্থাকে ইতিবাচক একটা জায়গায় নিয়ে আসা। সেটা আনতে গিয়ে ওই জায়গায় চলে গেছে। আমাদের লাইব্রেরিতে খবরের কাগজ পড়ার জন্য সাত-আটজন আসে, বইয়ের জন্য একজনও আসে না। কোথায় আমাদের লাইব্রেরির ব্যাপারটা? সবটাকে নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে। তবে এখন যেভাবে কথাটা আসছে, সেটার মধ্যে একটা খারাপ ইঙ্গিত আছে। আসলে আবেগপরায়ন সরকার, সিস্টেম বলে তো কিছু নেই। আমার প্রতিনিয়ত নিজের সঙ্গে একটা তর্ক চলে। তবে এটা আমি বুঝতে পারছি, আমরা যতই বিপ্লবী হই, আমাদের চালায় আনন্দবাজার। এটা আমি জোর গলায় বলতে পারি, তারাই আমাদের কোন আন্দোলন করতে হবে ঠিক করে দেয়।

সত্যব্রত ঘোষাল : আপনি ব্যাপারটাকে এইভাবে ভাবুন, আমাদের ছোটোবেলায় লাইব্রেরিগুলো ভালো চলত। যখন দেখলাম, সেখানে একজন লাইব্রেরিয়ান সরকারি কর্মচারী হিসেবে এসে গেছে, তখনই আমি ধরে নিয়েছি আমার আর ওখানে কোনো দরকার নেই। আমার উদ্যোগটাকে আমি গুটিয়ে নিয়েছি।

দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় : আমার তা মনে হয় না। আমার মনে হয়েছে, যিনি গ্রন্থাগারিক হয়েছেন, তিনি যত না গ্রন্থাগারের কাজ করছেন, তার চেয়ে বেশি সরকারি নির্দেশ পালন করছেন। যেমন, আমি লাইব্রেরির সেক্রেটারি, আমি চাইছি রবিবার লাইব্রেরি খোলা থাকবে, তার জন্য সপ্তাহে দুদিন ছুটি নেওয়া হোক। রবিবার ছাড়া পাঠক আসে না। বলছে, অ্যাসোসিয়েশনের সিদ্ধান্ত আছে, রবিবার ছুটি দিতে হবে।

সত্যব্রত ঘোষাল : এটা ঠিক নয়। ওই লাইব্রেরিটা রবিবার খুলতে পারবে কি পারবে না, তারও সরকারি কতকগুলো ব্যতিক্রমী ব্যবস্থা আছে। আপনারা অ্যাপিল করেননি। বালি পাবলিক লাইব্রেরি, ১২৬ বছরের লাইব্রেরি, সেই লাইব্রেরি কিন্তু বন্ধ হয় না। সেখানে একটা রেজিস্টার্ড পাবলিক বডি তৈরি হয়েছিল, সরকারি চাকরি যারা করে তাদের বাদ দিয়ে 'ফ্রেন্ডস অফ্ দি লাইব্রেরি' নামে একটা মুভমেন্ট গড়ে ওঠে। লাইব্রেরিগুলো সাধারণ মানুষেরা তৈরি করেছিল, এই স্কিম আসার পরে আমাদের ধারণাই হয়ে গেল, লাইব্রেরিতে আমাদের আর কোনো অংশগ্রহণ নেই। আমরা আমাদের যতটুকু উদ্যোগ ছিল, তা গুটিয়ে নিয়েছি। এইবার সেই অঞ্চলের এমএলএ বা মেয়র বা কমিশনার ওই লাইব্রেরিটা দখল করে ফেলেছে। যার ফলে এসেছে ওই গণশক্তি আর আজকালের আধিপত্য, ওদের নেটওয়ার্ক সাঙ্ঘাতিক বেড়ে গেছে। আপনি কিন্তু সেই জায়গায় ঢুকতে পারেননি।

একটা কথা আজকের অর্ডারে আছে, কোনো রাজনৈতিক সংবাদপত্র ... তার কারণটা কিন্তু ওইখানে।

প্রণব দে : লাইব্রেরির ব্যাপারে যাঁরা জড়িত, তাঁদের মতো অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলছি না। এই অর্ডার থেকে একটা জিনিস মনে হয়েছে, এটা আলাদা কিছু নয়। হঠাৎ করে একদিন লাইব্রেরি বা পত্রিকার ব্যাপারে একটা অর্ডার আসেনি। দেখবেন, পরপর কতকগুলো ঘটনা ঘটছে, তার সঙ্গে এগুলো জড়িত। যেমন ধরুন এই লিট্‌ল ম্যাগাজিনের বিজ্ঞাপনের টাকা বন্ধ করে দেওয়া, এতে এমন কিছু টাকা ব্যয় হত না, সরকার এতরকম দান-খয়রাতি করছে, এতে একটা নীতিগত জায়গা ছিল, লিট্‌ল ম্যাগাজিন আন্দোলনকে সাহায্য করা। এর আগে হয়তো কিছু দলবাজি হয়েছে, কিন্তু সেটা পুরো বন্ধ করে দেওয়ার কোনো অর্থ হয় না। আবার, প্রথম থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, একটু বিরোধী কথা বললেই — আমরা দেখলাম মেট্রো চ্যানেলে এপিডিআরের মিটিং একটা বাজে যুক্তি দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হল। এটা ঘটনা এই অর্ডারে যদি আনন্দবাজারের নাম থাকত, তাহলে স্টার আনন্দ এত হইচই করত না। কিন্তু এটাও তো ভাববার কথা, যে সুমন মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে এত ইন্টারভিউ করল, হঠাৎ কী হল? পছন্দের কথা বলতে হবে আর অপছন্দের কথা বললেই মনে হবে ৩৪ বছরের ব্যাপার, এই ব্যাপারটা, সত্যিই যেন সব জায়গাতেই সিপিএমের ভুত দেখছে। মানুষকে নিয়ে চললে তো ভুত দেখার কথা নয়। কীরকম একটা অনাস্থা এসে গেছে মানুষের প্রতি। আগের সিস্টেমে যেটা ছিল, মাস্টারমশাই আপনি কিছু দেখেননি ... মাস্টারমশাই বাড়ি চলে গেলেন, কেউ জানতেই পারল না কী ঘটেছে। এখন সেই জায়গায় এই সব কাণ্ড হচ্ছে। গণশক্তি? প্রত্যেকটা সেক্রেটারিয়েটে ৫টা করে কাগজ রাখতে হবে, তার মধ্যে একটা গণশক্তি অবশ্যই থাকবে। আপনি গোবিন্দপুর থেকে উচ্ছেদ করে নোনাডাঙায় বসালেন। এখন অন্য লোককে সেখান থেকে উচ্ছেদ করতে চাইছেন। আমার কথাই শুনতে হবে! এটার বিরুদ্ধেই তো পশ্চিমবঙ্গ আপত্তি করেছিল গতকাল। আজকে সেই জায়গাটা যদি ফিরে আসে, একেবারে গোড়ার দিকেই, এগুলো একটা লক্ষণ, অনেক কিছুর মধ্যে এই অর্ডারটাও আছে। সবটা মিলে আমার যেটা মনে হয়, লিট্‌ল ম্যাগাজিনের পক্ষ থেকে এই বাক্ স্বাধীনতা হরণের বিরুদ্ধে বলা দরকার। যখন মরিচঝাঁপির মতো ঘটনা ঘটেছে, তখন এত প্রতিবাদ হয়নি। কিন্তু আজ তো উঠছে। এটা একটা ভালো লক্ষণ।

সায়ন্তনী নাগ : ওই যে কথা হল, এতগুলো গণশক্তি রাখতে হবে, এটা আগের সরকারের আমলে একটা সূত্র থেকে চাপ আসত। এখন সেটা নেই। এখন এইভাবে অর্ডার করতে হচ্ছে, একটা রেজিমেন্টেড পার্টির সঙ্গে একটা আবেগতাড়িত পার্টির যেটা বেসিক তফাত। আর এই আশঙ্কা আমার মনেও থাকছে, এটা একটা কিছু সূচনা কিনা। পাবলিক লাইব্রেরিগুলোয় খবরের কাগজ পড়ার লোক শুধু আসে, বই পড়ার আকর্ষণ কমছে, বিশেষত পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে, এইভাবে চলতে থাকলে লাইব্রেরিগুলো বন্ধ করে দেওয়ার দিকে এটা কোনো পদক্ষেপ কিনা সেটাও চিন্তার।

জিতেন নন্দী : তাহলে কি যেভাবে পাবলিক হাসপাতালগুলোকে তুলে দেওয়ার চিন্তা এসেছে, এক্ষেত্রেও সেরকম ভাবনা আছে?

সত্যব্রত ঘোষাল : একটা ঘটনা তাহলে বলি। গার্হস্থ্য জীবনে বিয়ে করার পরে আপনারা ঝাল খান, আপনার স্ত্রী ঝাল খেতেন না। কিন্তু রান্নায় ঝাল বাড়াতে বাড়াতে সেটা মানিয়ে নেওয়া হল। তাহলে এই যে অর্ডার বা নোনাডাঙার ঘটনা, এগুলো দিয়ে কি টেস্ট করা হচ্ছে না? এর পরের সিদ্ধান্ত ওরা নেবে। কারণ খুবই ছোটো জায়গা, ১৮ কোটির একটা বাজেট এই ডাইরেক্টরেটের। কিন্তু এই ছোটো ঘটনা থেকেই কিন্তু বড়ো ঘটনার দিকে যায়।

জিতেন নন্দী : এই অর্ডার শুধু গণশক্তি বা আনন্দবাজার থাকবে কি থাকবে না, এই স্তরে আটকে নেই, আরও একটু এগিয়ে গেছে। এই

যে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত পত্রিকা এবং যেটা মনে হচ্ছে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত (purported to be ...), যেমন 'পরিকথা' পত্রিকাও মনে হতে পারে মাওবাদী দলের সঙ্গে যুক্ত, তাহলে আমি লাইব্রেরিতে 'পরিকথা'ও রাখা বন্ধ করতে পারি। এর সঙ্গেই রয়েছে 'মুক্তচিন্তা'র কথা। তাহলে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে না থাকা পত্রিকা বলতে মুক্তচিন্তা আর রাজনৈতিক দল বা রাজনীতি ব্যাপারটা মুক্তচিন্তার বাইরে? এটা কোন ইঙ্গিত? সবাই রাজনীতি করবে, যারা দেশ চালাচ্ছে তারা প্রত্যেকে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত আর লাইব্রেরিতে এসে আমি পাবলিককে বলছি তুমি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত পত্রিকা পড়বে না। আর সেটাই মুক্তচিন্তা। তাহলে এই অর্ডার কি শুধু সিপিএমকেই আটকাচ্ছে নাকি আরও বেসিক জায়গায় আক্রমণ করছে?

রঞ্জন রায় : লাইব্রেরিতে নানা ধরনের লোক আসবে, নানা ধরনের বই ও পত্রিকা পড়বে, এটাই কিন্তু লাইব্রেরির আদর্শ হওয়া উচিত ছিল। রাজনীতি আটকানোর জন্য অর্ডারে বলা হচ্ছে, এটা মনে হয় না।

বিমল সেন : যে আটটা কাগজ মনোনীত হয়েছে অর্ডারে, তার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা এক বিশেষ রাজনৈতিক দলেরই রাজ্যসভার সাংসদ। তাহলে 'অভিপ্রায়' (purported) বলে যে কথাটা আসছে, সেটা তো এই কাগজগুলোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আর একটা কথা, যেমন রহড়া ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরি বা টাকি ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরি ১৯৬৫ সাল থেকে যে কাগজগুলো নেয়, এগুলোর একটা সংগ্রহ হিসেবে সংরক্ষণ করার (archival value) মূল্য আছে। এই যে আবার আটকে দেওয়া হল, এই কাগজগুলো — আনন্দবাজার, আজকাল, বর্তমান — আর কোথাও পাবেন না আপনি। আপনি বলতে পারেন ইন্টারনেট এডিশন আছে। কোনো পাবলিক লাইব্রেরিতে গেলে যে এই কাগজগুলো সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যাবে, তা নয়। কিন্তু একমাস-দুমাস খুঁজলে পাওয়া যাবে, যেভাবে সব গবেষক কাজ করে আমাদের দেশে। সেই জায়গাটাও কিন্তু ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, যখন আপনি পাবলিক লাইব্রেরিতে কাগজগুলো আটকে দিচ্ছেন।

আর একটা কথা আসা দরকার। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ৫৩টা সরকারি লাইব্রেরি আছে। যেমন, রাইটার্স বিল্ডিংয়ের লাইব্রেরি, গেজেটিয়ার লাইব্রেরি, বিকাশ ভবনে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টাল লাইব্রেরি, এই ৫৩টা লাইব্রেরিতে এই অর্ডার কার্যকর হয়নি। টার্গেটটা শুধুমাত্র পাবলিক লাইব্রেরি। আর একটা যোগাযোগ আমার যতদূর মনে পড়ছে, ১৯৯৩-৯৪ সালে 'বর্তমান' কাগজে বরুণ সেনগুপ্ত একটা লেখা লিখেছিলেন, গ্রন্থাগার আইনে তৈরি হওয়া গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলোই সিপিএমের আঁতুড়ঘর। এই ভাষাতেই শিরোনামটা ছিল। সুতরাং এটা একদম ঠিক কথা, সমস্ত লাইব্রেরিগুলোর পরিচালন সমিতির নির্বাচন সদস্য পাঠকদের প্রতিনিধি নির্বাচন বলা হলেও এটা হয় একটা রাজনৈতিক নির্বাচন। লাইব্রেরি নির্বাচনে হাজার হাজার টাকা খরচ হয়, ঢালাও প্রচার হয়। স্কুলে যেরকম পরিচালন সমিতি নির্বাচন হয়, এখানেও সেই ঘটনাই ঘটে। তারপর নির্বাচিত হয়ে এসে যখন দেখে লাইব্রেরিতে টাকাপয়সা বলতে তেমন কিছুই নেই, আস্তে আস্তে এরা আর লাইব্রেরিতে আসাই বন্ধ করে দেয়।

একটা রুরাল লাইব্রেরি বছরে মোটামুটি একশোটা বই কিনতে পারে, কমপক্ষে পঞ্চাশটা। ১৯৮১ থেকে ২০১১, ত্রিশ বছরে পঞ্চাশটা করে বই হলে মোট ক-টা বই হয়? আগে হয়তো পাঁচশো বই ছিল, যোগ হল দেড়হাজার, তাহলে কমপক্ষে দু-হাজার বই একটা রুরাল লাইব্রেরিতে থাকা উচিত। আপনি একটা রুরাল লাইব্রেরিতে গেলে পাবেন ছ-সাতশো বই। সত্য হল, যে মুহূর্তে এগুলো স্পনসরশীপে গেছে, সাধারণ মানুষের কাছে এই বার্তাটা গেছে, সরকারি লাইব্রেরি হয়ে গেছে, আমাদের আর কোনো ভূমিকা নেই। যারা সরকারি কর্তৃত্ব না মেনে আলাদা থেকে গেছে, তারা ধুঁকছে। আপনি তাকিয়ে দেখুন, বজবজ পাবলিক লাইব্রেরির অবস্থাটা। কাজেই এটা হতেই পারে, এই অর্ডার একটা বড়ো প্ল্যানের প্রথম স্টেপ।

তবে অন্যদিকে ন্যাশনাল নলেজ কমিশন যেভাবে ইনফর্মেশন সোসাইটি ও নলেজ সোসাইটির দিকে দেশকে নিয়ে যাবে বলে পরিকল্পনা করেছে, সেখানে পাবলিক লাইব্রেরি খুবই গুরুত্ব পেয়েছে। কিন্তু সেখানে পাবলিক লাইব্রেরির চরিত্র বদলে যাচ্ছে। আর একটা কথা খুব গুরুত্বপূর্ণ, বাংলা বইয়ের প্রকাশকেরা প্রায় ভিখারির মতো দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে, রাজা রামমোহন রায় ফাউন্ডেশনে তাদের কত বই সিলেক্ট হবে। আড়াই হাজার স্পনসর্ড লাইব্রেরিতে যে বই যায়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক কোটি টাকা দেয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের রাজা রামমোহন রায় ফাউন্ডেশন নামের একটা অটোনমাস সংস্থা — যাদের কাজ হল ভারতবর্ষের পাবলিক লাইব্রেরির ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড সার্ভিস ডেভলপমেন্ট — সমান পরিমাণ টাকা দেয়। এক কোটি করে মোট দু-কোটি টাকার বই কেনা হয়। প্রেস রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্টে যে বইগুলো ভবানী ভবনে জমা পড়ে, সেখান থেকেই সিলেকশন করা হয়। এদের বুক সিলেকশন কমিটি ঠিক করে, এর মধ্য থেকে তারা দু-কোটি টাকার বই কিনবে। এই বইটা আসবে এই আড়াই হাজার পাবলিক লাইব্রেরিতে। এছাড়া সরকারি গ্রান্ট তো আছেই। এবার দিল্লির প্রকাশকেরা বাংলা প্রকাশনের জগতে ঢুকবে। তারা আরটিআই করে জানতে চাইছে, কী ধরনের বই চলে, অর্থাৎ মার্কেট সার্ভে করছে।

মিত্রা চ্যাটার্জি : মিডিয়া বা আনন্দবাজার-বর্তমান বিষয়টা তুলে ধরার পর আমরা আলোচনায় বসছি। তাহলে মিডিয়াই কি আমাদের প্রতিবাদের বিষয় সব কিছু ঠিক করে দিচ্ছে?

বিমল সেন : আপনাকে হয়তো এখানে সবটা খুলে বলতে পারব না। 'স্টার আনন্দ' এই খবরটা করতে পারত না, যদি পাবলিক লাইব্রেরি জগতেরই কোনো লোক এই খবরটা ওদের না দিত। তারা দিয়েছে অন্য ইন্টারেস্টে, এই মুহূর্তে ইমপ্যাক্টটা চাই। ইমপ্যাক্টটা 'স্টার আনন্দ' ছাড়া হবে না। অথচ গত এক সপ্তাহ যাবৎ 'বর্তমান' প্রতিদিন এই বিষয়ে কিছু লিখেছে।

জিতেন নন্দী : লিট্‌ল ম্যাগাজিন আন্দোলনের দিকে আমাদের তাকানো দরকার। প্রত্যেকটা জেলায় এখন একাধিক দৈনিক সংবাদপত্র আছে। হুগলি, বর্ধমানে আছে, উত্তরবঙ্গে তো বেশ কিছু আছে। দৈনিক বাদ দিয়ে মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিকে যদি আসি, আমাদের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় তো নিয়মিত-অনিয়মিত নিয়ে পঞ্চাশটা কাগজ আছে। আমাদের সমস্যাটা অন্য জায়গায়। আমরা কিন্তু ছোটো কাগজের লোকেরা নিজেদের পত্রিকা বের করার জায়গায় অতটা সিরিয়াস থাকতে পারছি না। নানা কারণে, কোনো সময় আর্থিক কারণে, কোনো সময় ঠিকমতো বিলিবন্টন না করতে পারার জন্য, আমাদের মধ্যে একটা দুর্বল জায়গা কাজ করছে। এই যে সংকট, আমাকে আনন্দবাজার বা স্টার আনন্দের মাধ্যমেই জানতে হবে, ওদের মধ্যে

দিয়েই বুঝতে হবে, এই যে জায়গাটা দাঁড়িয়েছে এর খারাপ দিকটা হল, প্রত্যেক কাগজের পিছনে একটা রাজনীতি আছে, একটা কর্পোরেট স্বার্থ আছে, ইত্যাদি। সেই পলিটিক্স সমেত কথাটা আসছে, একটা রাজনৈতিক মোড়কে। পুরো কথাটাও আসছে না। আজ এখানে এই অর্ডারের তাৎপর্য নিয়ে যে কথা হচ্ছে, সেটা পুরো তো ওখানে আসছে না। এই অভাবটা যদি পূরণ করতে হয়, তাহলে আমাদের লিট্‌ল ম্যাগাজিনগুলোকে আরও সক্রিয় হওয়া দরকার। পাবলিক লাইব্রেরি হোক বা পাবলিক যে কোনো প্রতিষ্ঠান হোক, সেখানে কী অর্ডার হচ্ছে, সেগুলো জানার একটা চেষ্টা তো আমাদের থাকা উচিত। একটা ছোটো কাগজ 'সংবাদমন্থন' সবটা না জানতে পারে। কিন্তু 'অনীক', 'পরিকথা', 'নতুন শতক', 'আকিঞ্চন', 'বাংলার মুখ' বা অন্যরা মিলে তো সবটা পূরণ হতে পারে। এইভাবে সম্মিলিত একটা প্রোগ্রাম তো আমরা নিতেই পারি। নিলেই যে কালই সফল হবে তা নয়। দশ–পনেরো বছরের চেষ্টাতেও যদি হয়, তাহলে তো আনন্দবাজারের কাছ থেকেই ঘি খেতে হবে, এখান থেকে মুক্ত হতে পারি। আজকে নোনাডাঙা বস্তিবাসীদের জটিল অবস্থাটা কি আনন্দবাজারের মধ্যে দিয়ে উঠে আসবে? 'স্টেট্‌সম্যান' লিখে চলেছে ওখানে 'মাতঙ্গিনী মহিলা সমিতি' মাওবাদী মদতে কাজ করে চলেছে। কিন্তু এটা কি সত্যি? মাওবাদীরা থাকতেই পারে। কিন্তু ওখানে বহু সংগঠন ও ব্যক্তিরা কাজ করেছে। তাদের আলাদা আলাদা উদ্যোগটা মিডিয়া নস্যাৎ করে দিল, সবটাকে একটা ব্র্যাকেটে পুরে দিল 'মাওবাদী'! এটা বিকৃত ও পরিকল্পিত। আমাদের লিট্‌ল ম্যাগাজিনের পারস্পরিক কাজের একটা ফোরাম দরকার। আমরা আমেরিকার সাম্প্রতিক অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট আন্দোলনে কিন্তু এই পারস্পরিক উদ্যোগটা দেখেছি।

দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় : প্রকৃতপক্ষে মুক্তচিন্তার কাগজ করা দরকার।

উচ্ছেদ এবং পুনর্বাসন : কিছু ভাবনা

শমীক সরকার

নোনাডাঙা নামটির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল সেই গোবিন্দপুর রেলকলোনি উচ্ছেদের সময়। কিংবা তারও আগে গড়িয়া টালিনালা উচ্ছেদের সময়। নোনাডাঙা ছিল সেই জায়গা যেখানে উচ্ছেদ হওয়া বস্তিবাসীদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে, বামফ্রন্ট সরকারের তরফে সেরকমই জানানো হয়েছিল। সেটা ২০০২–২০০৩ সাল বোধহয়।

রেলকলোনি উচ্ছেদের সময় খুব জলঘোলা হয়েছিল। রেল থেকেই বলেছিল বোধহয়, উচ্ছেদ করার জন্য। রাজ্য সরকার তা কার্যকর করার চেষ্টা করে। দিনক্ষণ বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। বস্তিবাসীরাও প্রতিরোধের প্রস্তুতি নিয়েছিল। অবশেষে উচ্ছেদ করা হয়নি। জোর করে উচ্ছেদ না করে বস্তিবাসীদের তরফে তৎকালীন বিধানভায় বিরোধী নেতা তৃণমূল কংগ্রেসের সৌগত রায়ের সঙ্গে রফা হয়েছিল রাজ্য সরকারের। গোবিন্দপুর রেলকলোনি নোনাডাঙায় উঠে যাবে। কয়েক বছরের মধ্যে তাদের পুনর্বাসনের ফ্ল্যাট দেওয়া হবে সেখানে। এই লড়াই প্রতিরোধ নিয়ে নাটক হয়েছিল খুব। আনন্দবাজারের প্রথম পাতায় বন্দুক লুকিয়ে রাখা বস্তিবাসীর ছবি বেরিয়েছিল। উচ্ছেদ অভিযান প্রত্যাহার করে নিয়ে বামফ্রন্ট বলেছিল, মারপিট হওয়ার ভয় ছিল। তাই প্রত্যাহার করা হল অভিযান। মিডিয়ায় কংগ্রেসের সুব্রত মুখার্জি বলেছিলেন, দিনক্ষণ ঠিক করে দিয়ে উচ্ছেদ করা যায় না। উচ্ছেদ প্রত্যাহার করাকে তৃণমূল নিজেদের জয় হিসেবে দেখিয়েছিল।

বেলেঘাটা বা টালিনালার আশেপাশের বস্তিবাসীদের অবশ্য এই সৌভাগ্য হয়নি। তাদের প্রতিরোধের 'জয়' হয়নি। সেখানকার কিছু ঘর নিজে থেকে উঠে গেছিল আগে আগেই। বাকি ঘর ভাঙা পড়েছিল বুলডোজারের আঘাতে অথবা পুড়েছিল আগুনে।

জবরদখল

শহর কলকাতা বলে আমরা এখন যে অংশটিকে জানি, তার দক্ষিণের অনেকটাই তৈরি হয়েছে চল্লিশ পঞ্চাশ বছরের মধ্যে। এর অনেকটা অংশে উদ্বাস্তু মানুষ জঙ্গল কেটে, পাড়া বানিয়ে, কলোনি বানিয়ে, রাস্তা করে, মাঠ করে, পুকুর করে, গাছ লাগিয়ে শহর তৈরি করেছে। এর সরকারি নাম 'জবরদখল' কলোনি। চিল্লিয়ে গলা ফাটিয়ে, পার্টির মিছিলে হেঁটে, দাদা দাদা করে, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ করে জায়গা জমি বাড়ির স্বত্ব আদায় করেছে লোকে। ওই একইভাবে আদায় করেছে রেশন কার্ড, পরিচয়পত্র, ইলেকট্রিক কানেকশন। সবাই যে জমিস্বত্ব পেয়ে গেছে এমন নয়। সরকারি আইনে কলোনি স্বীকৃত হওয়ার পর দশ এগারো বছর লেগে যায় জমিস্বত্ব পেতে। গত শতকের নয়ের দশকের শুরু থেকে জমিস্বত্ব পাওয়া শুরু হয়েছে। বাড়ির জমিস্বত্ব পাওয়ার পর অনেকেই সেই জমি প্রোমোটারকে দিয়ে দিচ্ছে। ছোটো ছোটো টালির চাল, দরমা বা প্লাস্টারবিহীন ইটের একতলা ঘরের জায়গায় তৈরি হচ্ছে তিন চারতলা ফ্ল্যাটগুচ্ছ। তার একটি পাচ্ছে ওই জমিস্বত্বাধিকারী। বাকিগুলি প্রোমোটার বিক্রি করছে। ফ্ল্যাট তৈরি হচ্ছে কলোনি বাদে অন্য বসতিগুলিতেও। জমি ঘিরে, পুকুর বুজিয়ে বা পুরোনো বাড়ি ভেঙে। আর এসব কিনছে অধুনা গ্রাম–মফস্বল থেকে শহর কলকাতায় আসা বা আসতে চাওয়া সরকারি/বেসরকারি চাকুরিজীবীর দল। এসবই কেনা হচ্ছে ব্যাঙ্ক লোনে। ব্যাঙ্কের সেই লোন শোধ করতে কারো লাগবে ২০ বছর, কারোর ৩০, কারোর আরও বেশি। ব্যাঙ্কের সুদের হারের বাড়া কমার ওপর এই ধারের সময়সীমা বাড়ে কমে।

'স্বত্বাধিকারী'রা ছাড়াও শহর কলকাতায় থাকে ভাড়াটেরা। সাম্প্রতিক জনগণনায় দেখা গেছে, চেন্নাই শহরের ৫৩ শতাংশ মানুষই ভাড়াটে। কলকাতায় কাছাকাছিই হবে। ছোটো টালির ঘর থেকে শুরু করে ফ্ল্যাট — সব জায়গাতেই ভাড়াটেরা থাকে।

এইভাবেই জমির কাগজপত্র না থাকা বা সদ্য হওয়া ঘর বসতিতেই ভর্তি এই কলকাতা শহর, অন্তত তার দক্ষিণাংশ। সত্যি বলতে কী, আজকের কলকাতার বেশিরভাগ অংশই গড়ে উঠেছে হাল আমলে জবরদখলের মধ্যে দিয়ে।

এই জবরদখল উদ্বাস্তু কলোনির পাশাপাশি অনেক দিন ধরেই

শহর কলকাতায় আরেকটি জবরদখলেরও ইতিহাস আছে। তার হয়তো বাংলাদেশ থেকে আসা উদ্বাস্তুদের মতো লড়াই সংগ্রামের গরিমা নেই। কিন্তু মূলত দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সুন্দরবনের গ্রামগুলো থেকে আসা এই মানুষেরাও ওই উদ্বাস্তু কলোনিগুলির পাশাপাশি গড়ে তুলেছে নিজেদের বসতি। সেইগুলি নিয়েই তৈরি হয়েছে কলকাতার বস্তি। তারপর সেই বস্তিতে ঘরভাড়া নিয়েছে, ঘর কিনেছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মানুষ, আবার বাংলাদেশ থেকে পরে আসা মাটির মানুষরাও। কলকাতার বস্তিগুলি বসার একটা নকশা আছে। মূলত জলাশয়-পুকুরের পারে, খালের পারে, রেললাইনের ধারে গড়ে উঠেছে এই বস্তিগুলো। আমাদের চেনাজানার সীমানায় আমি এমনটাই দেখেছি।

নিচুতলার লেনদেন

কলকাতায় দালালি, আগাম ছাড়া ঘরভাড়া পাওয়া যায় না এখন। বস্তিগুলোতেও পাওয়া যায় না। উদ্বাস্তু জবরদখল কলোনিতে জমির কাগজপত্র না থাকলেও যেমন ঘরের হাতবদল হয়, তেমনই বস্তির ঘরেরও 'মালিকানা' বদল হয়, হাজার হাজার টাকার বিনিময়ে। সরকারি বা আইনি বাজারের পাশাপাশিই কলকাতায় বসতি নিয়ে গড়ে উঠেছে এই নিচুতলার লেনদেন। জমি, জায়গা, ফ্ল্যাট, বাড়ি মহার্ঘ হওয়ার সাথে সাথে এই লেনদেনের অঙ্কও মোটাসোটা হয়। গতরখাটা কাজের সন্ধানে আসা গ্রামের মানুষ শহর কলকাতায় ভাড়া খোঁজে যখন, তখন সে আইনি বাড়ির সন্ধান করে না। সে কম পয়সার ভাড়া বাড়ির খোঁজ করে। সেটা কলোনি হোক, বা বস্তি। টালি চালার হোক, বা অ্যাসবেসটস, টিন। আর গ্রাম থেকে কলকাতায় শিক্ষা বেচে খেতে আসা, তুলনায় কম সংখ্যক মানুষ খোঁজে ছাদওলা ঘর।

কলকাতায় বেশিরভাগ বস্তি বসতে কাউকে না কাউকে টাকা দিতে হয়েছে। বস্তি একবার বসে যাওয়ার পর, সেই বস্তিতে একটা ঘর করতেও টাকা দিতে হয়। কলকাতায় দীর্ঘদিন ধরে বস্তিতে থাকা মানুষদের কাছেই এমনটা শুনেছি। টাকা নেয় এলাকার প্রভাবশালী ক্ষমতাশালী ব্যক্তি, গুণ্ডা, পার্টি নেতাদের চামচে, কিংবা বস্তির নেতা। একবার একটা বস্তি বসলেই শুরু হয়ে যায় পরিষেবা আদায়ের কাজ। ইলেকট্রিক লাইন আনা, মিটার বসানো, টিউবওয়েল বা অধুনা ট্যাপকলের লাইন টানা, কোথাও কোথাও বাথরুম পায়খানার বন্দোবস্ত ...। এসব করতে করাতে পয়সা তো দিতেই হয় (নোনাডাঙার লেকপল্লির শ'দুয়েক ঘর মিলে পাঁচ লক্ষ টাকা দিয়ে ইলেকট্রিক আনার কথা শুনেছি কিছুদিন আগেই), শাসক পার্টির মিছিলেও হাঁটতে হয় মুহুর্মুহু। বস্তি থেকে ওঠে পার্টির ক্যাডার। পার্টির বস্তি সংগঠনও থাকে। আবার ওই বস্তি সংগঠনের মাধ্যমেই শহর কলকাতায় জবরদখল 'আইনি' বা 'স্বীকৃত' হওয়ার দিকে হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগিয়ে চলে। একেকটি পরিষেবা পাওয়া এই আইনিকরণের দিকে একেকটি পদক্ষেপ। যে যত এগোয় তার জোর তত বেশি। তা টের পাওয়া যায়, যখন দেখা যায় উল্টোডাঙা স্টেশন সংলগ্ন বাসন্তী কলোনি বা কালিকাপুর দীঘি সংলগ্ন বস্তি পুড়ে গেলে তা পুনর্গঠনের কাজে টাকা, ভিনাইল, তার্পোলিন দিয়ে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে কলকাতা পুরসভার স্থানীয় কাউন্সিলররা। সেসব নিশ্চয়ই সরকারি তহবিল থেকেই দেওয়া হয়! যেসব বস্তি এইসব পরিষেবা আদায়ে যত এগিয়ে, সেই সব বস্তিতে ঘরের ভাড়া, দাম প্রভৃতি তত বেশি। কাউন্সিলর বা পার্টি নেতারা এইসব বস্তির ব্যাপারস্যাপারে সরাসরি হস্তক্ষেপও করে থাকে। সম্প্রতি কালিকাপুর দীঘির পাড়ে বস্তি পুড়ে গেলে পুনর্গঠনের সময় এলাকার শাসক পার্টির নেতা বলে গেছেন, ভাড়াটেরা আর ভাড়া দেবে না, নতুন ঘরের তারাই মালিক।

নোনা স্বাদ

ঝড়ে উঠে আসা ঢেউয়ে
ধানখেতে নেমেছিল জলে,
শহরের উপকণ্ঠে
উচ্ছেদের ডাঙায় এখন
আবাদি মানুষ জানত না
কতদূর বাদাবন
কতখানি রাষ্ট্রীয় সীমা
কোথাও পালিয়ে গিয়ে বাঁচা যাবে ভেবেছিল
পাওয়া যাবে অন্য স্বাদ অন্য কোনো উপজীবিকা,
সঙ্গে যাবে, ভুলে গিয়েছিল —
ছেঁড়া জিভ, বোবা কথা, অশ্রুগ্রন্থী, লোহিত কণিকা।

তমাল ভৌমিক, এপ্রিল ২০১২

শহর থেকে জবরদখল উচ্ছেদ : ভুঁইফোঁড় ভদ্দরলোকি অনৈতিকতা

শহর কলকাতার এই জবরদখল, এই অসরকারি বা লেখাজোখাবিহীন লেনদেনের কথা সংসদীয় গণতন্ত্রের দলগুলো বিলক্ষণ জানে এবং মানে। এলিট সমাজের আরেকটা অংশ : আমলা, মিডিয়া কলমচি বা আইনবাগীশেরা হয়তো রেগে যায়। কিন্তু জনপদ তো চিরকালই গড়ে উঠেছে এইভাবেই। আমি তো কেবল উদ্বাস্তু কলোনির কথা আর সুন্দরবনবাসীর বস্তির কথা উল্লেখ করলাম। কলকাতার তথাকথিত পুরোনো বাসিন্দাদের ইতিহাস আমি ঠিক জানি না। তবে তাদের ইতিহাসও কি জবরদখল, বা কাউকে সামান্য কিছু টাকা দিয়ে জায়গা/বাড়ি কেনা — এর চেয়ে আলাদা কিছু? মাত্র কয়েকশো বছর আগে সমুদ্রবাণিজ্যের নৈকট্যের কারণে গড়ে ওঠা এই শহরের জনপদের ইট কাঠে কি মানব সমাজের চিরাচরিত নিয়ম নীতি পন্থারই প্রতিফলন নেই? কলকাতা নিশ্চয়ই কলকাতাবাসীর জমিদারী নয়? আইন কানুন তৈরি হয়, বদলায়, কিছু বছর অন্তরই, সেসবও হয় মানুষের গতি-প্রকৃতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে। আইন-কানুন করে নিশ্চয়ই মানুষ বা জনগোষ্ঠী তৈরি হয় না। মানুষই আইনকানুন বানায় নিজেদের দরকার মতো! জবরদখল কলোনির আইনি স্বীকৃতি, জমির কাগজ, বস্তি পুড়ে গেলে ক্ষতিপূরণ — এসবই তো সেই মতোই, তাই না?

এসব কথা জেনে বুঝে, গোবিন্দপুর রেলকলোনি বস্তি উচ্ছেদ অভিযান করার প্রাক্কালে তৎকালীন শাসক জোট বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু বলেছিলেন, ওরা জবরদখলকারী! ঠিক এইসময়ে এসেই আজীবন 'গরিবের রাজনীতি' করে আসা একজনের এলিট অবস্থানটি বেরিয়ে আসে। তখন জনসমাজের চিরাচরিত প্রথার পরিপন্থী একটি রাষ্ট্রীয়, আইনি, সরকারি কথামালা অস্ফুটে বেরিয়ে আসতে চায় মুখ দিয়ে : ওরা জবরদখলকারী, বেআইনি

বসবাসকারী, অতএব পুলিশ সান্ত্রী বুলডোজার চালিয়ে উচ্ছেদেরই যোগ্য। আজকের মন্ত্রীরাও যখন বুলি দেয় মিডিয়ায় বা মাইকে, আমরা পুনর্বাসন ছাড়া উচ্ছেদের বিপক্ষে, শুনলে মনে হয়, আহা কী মহান তোমরা! রাষ্ট্রীয় বাচনে এবং আমাদের শ্রবণে মননে উচ্ছেদ একটি নৈতিক অবস্থান হয়ে দাঁড়ায়। সরকারিভাবে যখন পুনর্বাসনের ফ্ল্যাটের কথা বলা হয়, তখন ভাবখানা এমন দেখানো হয়, যেন দয়া করলাম তোদের! এটাই আমাদের মানুষের সভ্যতা, যার গোটা অস্তিত্বের ইতিহাসের পৌনে ষোলো আনাই তথাকথিত জবরদখল! এমনকী ধর্মের বাচনেও তার স্বীকৃতি আছে, এই আকাশের নিচে কোনো একটা জায়গা বাসযোগ্য করেছে যে, জায়গাটা তার! একে অস্বীকার করার ভদ্দরলোকি অবস্থানটি আমাদের বৃহত্তর জনসমাজে ভুঁইফোঁড়। পুঁজিতন্ত্রের ধারকবাহকদের লালিত। এবং পুঁজির জোরেই সমাজের ভাবনার আকাশটিকে তা ছেয়ে ফেলেছে।

'বস্তিমুক্ত শহর' নির্মাণ : কর্পোরেট সমাজের নবাবি খোয়াব

শহর কলকাতা গড়ে ওঠার সাধারণ বা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া আমাদের দেশের আর পাঁচটা শহর গড়ে ওঠার মতোই। এইসব শহর গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে এতকাল আমাদের দেশে সরকারের কোনো সক্রিয় ভূমিকা ছিল না। তাই বলে পরিকল্পনা করে আমাদের দেশে কোনো শহর গড়ে তোলা হয়নি, তা নয়। বেশিরভাগই স্বাধীনতা পরবর্তী শিল্পশহর। যেমন দুর্গাপুর, কল্যাণী। আবার বেসরকারিভাবে পরিকল্পিত শহরেরও উদাহরণ আছে, টাটানগর, বাটানগর। এসবগুলি কোনো না কোনো ভারী শিল্প বা শিল্পাঞ্চলের লাগোয়া শহর। কিন্তু বিশ্বায়ন পরবর্তী পৃথিবীতে যখন আবাসন নগরায়ন নিজেই একটা শিল্প, যখন কর্পোরেট পুঁজি পণ্যদ্রব্য বা পরিষেবা বানানো থেকে অনেকটা এগিয়ে গিয়ে নিজেরাই মানবসমাজ বানিয়ে নেবে ভেবে ফেলেছে — তখন সরকারি বাচন 'পরিকল্পিত নগরায়ন', 'নগর পুনর্নবীকরণ' বা আরবান রিনিউয়াল কথাগুলো নতুন মাত্রা পায়। বোঝা যায়, শহরের প্রাকৃতিক বা সাধারণ গড়ে ওঠার ধরনটি কর্পোরেট সমাজের মনঃপূত নয়।

সাধারণ মানুষের নিজস্ব নির্মাণ, একতলা-দোতলা বাড়ি কিংবা ঘর, তার বদলে জায়গা করে নিতে থাকে বহুতল আবাসন। মাটি থেকে যত উঁচুতে থাকা, তত তার কৌলিন্য! নিজের ঘর বাড়ি নিজে দেখভাল করে নির্মাণের বদলে আসে প্রোমোটার ডেভেলপার। আসে রিয়েল এস্টেট কর্পোরেট। যুক্তি, এতে শহরের মহার্ঘ জায়গার খুব কম অংশ ব্যবহার করে অনেকে থাকতে পারবে। এখন এই চিন্তা ছড়িয়ে গেছে শহর কলকাতার জনসমাজেও। একতলা বাড়ির মালিককে বলা হচ্ছে, জায়গা নষ্ট করছেন! এখন একথা কেবল লোকাল প্রোমোটাররাই বলে না, আরও লোকেও বলে। কিন্তু এত লোকের চাপ কি শহর নিতে পারবে? সাউথ সিটির অত তলা বিল্ডিং — শহরের নিচের মাটির কী দশা হচ্ছে? কত জল লাগে সাউথ সিটিতে? এসব প্রশ্ন অবান্তর হয়ে যায়। এরকম নগর পরিকল্পনায় যুক্ত হয় শহরের 'গরিব'দের জন্য ভাবনাও। তাদের জন্য দশ-পনেরো কিংবা কুড়ি হাজার টাকার বিনিময়ে দেড়শো-দুশো স্কোয়ার ফুটের ফ্ল্যাট দেওয়া হবে।

২০০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে 'জহরলাল নেহরু আরবান রিনিউয়াল মিশন'-এর সূচনায় এই শহরের 'গরিব' মানুষদের নিয়ে অনেক কথা বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। তাঁর মোদ্দা বক্তব্য ছিল, স্বাধীনতার পর গত পাঁচ দশকের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে গ্রামপ্রধান দেশ ভারতবর্ষে শহরের গুরুত্ব বেড়েছে। লোকে গ্রাম ছেড়ে শহরে থাকতে শুরু করেছে। এখন সমস্ত উন্নয়ন ভাবনায় শহরকে মাথায় রাখতে হবে। গত এক দেড় দশকে এত দ্রুত নগরায়ন হয়েছে যে তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে পরিকাঠামো তৈরি হয়নি। ফলে শহর ভরে গেছে বস্তিতে। শহরে গরিব মানুষ নিজের থাকার জন্য আইনি সীমার বাইরে বেরিয়ে (extra legal) বন্দোবস্ত করেছে, যা ভয়ংকর। এর জন্য শহরে দারিদ্র্য ও অপরাধপ্রবণতা বাড়ছে। দূষণ বাড়ছে। বাস্তুতান্ত্রিক ক্ষতি বাড়ছে।

এই 'মিশন'-এর আওতায় একটি 'সাবমিশন' হিসেবে 'বেসিক সারভিস ফর আরবান পুওরস' বলে একটা স্কিমে এখন বস্তির পুনর্বাসনের ফ্ল্যাটগুলো তৈরি হচ্ছে। এই 'জহরলাল নেহেরু আরবান রিনিউয়াল মিশন'-এর মধ্যেই ২০১১ সালের জুন মাসে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, ভারতের আড়াইশোটা শহরকে 'বস্তি মুক্ত' করা হবে। এই যোজনার নাম, 'রাজীব আবাস যোজনা'। এতে শহরগুলির সমস্ত বস্তি তুলে দিয়ে (relocate বলে কথাটা আছে প্রস্তাবনায়) অন্য জায়গায় পুনর্বাসনের ছোটো ফ্ল্যাট এবং ভাড়াবাড়ি বানানো হবে। মুম্বই মিউনিসিপালিটির দেড়শো বর্গফিটের (মেঝের ক্ষেত্রফল) ঘর ৮০০ থেকে ১৫০০ টাকায় ভাড়ার উদাহরণও দেওয়া হয়েছে। এতে সাহায্য করবে এনজিও এবং 'কমিউনিটি বেসড' সংগঠন (ক্লাব, এমনকী পার্টির গণসংগঠনও এই আওতায় ঢুকে যাবে)। আর তা করা হবে ২০১৭ সালের মধ্যেই। শহরকে 'বস্তি মুক্ত' করার কথা বলার মতো নির্লজ্জতা সাত বছর আগের মূল প্রস্তাবে দেখাতে পারেনি কেন্দ্রীয় সরকার।

চক্ষুলজ্জা ও বাস্তব প্রয়োগ

এসব প্রস্তাবে কোথাও বলা নেই এবং চক্ষুলজ্জার খাতিরে কোথাও বলা থাকে না, শহর থেকে বস্তি উচ্ছেদ করে শহরের এক ধারে কোথাও পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এইসব প্রস্তাবগুলির বয়ান জুড়ে থাকে গরিব মানুষের জন্য ভালো ভালো সব বন্দোবস্তের কথা। এইসব কথা লিখে এবং তার কতটা পূরণ হয়েছে তার হিসেব খতিয়ান পার্লামেন্টে পেশ হয় বছর বছর। এইসব দেখিয়ে মিডিয়া, এনজিও, বিদেশি নেতাদের বাহবা কুড়ানো চলে। কর্পোরেট সমাজে তো বটেই, সামগ্রিকভাবে শিক্ষিত সমাজ তথা এলিট সমাজের মধ্যে একধরনের আত্মতৃপ্তির বোধ আসে। গরিব গুর্বোগুলোর জন্য কিছু করা গেল!

আর বাস্তবে শহর থেকে বস্তি তুলে দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয় শহরের বাইরে। শহর কলকাতার দক্ষিণ অংশের খালপার, রাস্তার ধার, পুকুরপার থেকে বস্তি উচ্ছেদ শুরু হয়েছে এইসব পরিকল্পনা আসার আগে থেকেই। কসবা রাজডাঙা, কালিকাপুরের খালপার, চৌবাগার মন্দিরপাড়া ... আরও কত কত বস্তি তুলে দিয়ে সেই জায়গায় হয়েছে আবাসন প্রকল্প। আর বস্তিবাসীদের একটা অংশ চলে এসেছে নোনাডাঙায়, তথাকথিত পুনর্বাসনের ফ্ল্যাটে, বাকি অংশ (যারা ভাড়া ছিল বা পুনর্বাসনের ফ্ল্যাটের ছোটো খুপরিতে যাদের পোষায়নি বা ধরেনি) গেছে অন্য বিভিন্ন বস্তিতে, ভাড়া বা ঘর নিয়ে। খুবই প্রতীকী একটি উদাহরণ হল, কলকাতায় বাইপাসের রাস্তার পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিকে মানুষের চলে আসা। ওই রাস্তার পশ্চিম দিকে মূল কলকাতা শহর, আর পূর্ব দিকে শহর বাড়ছে একটু একটু করে। কালিকাপুর থেকে সায়েন্স সিটির বাইপাস রাস্তার পূর্ব দিকের

যে কোনো বস্তিতে গেলেই শোনা যায়, তারা আগে ছিল রাস্তার পশ্চিমে। সেখান থেকে উঠিয়ে দেওয়াতে এখানে এসেছে।

এ তো গেল সরকারি পরিকল্পনার কথা। পরিকল্পনামাফিক উচ্ছেদের কথা। এছাড়াও আরেক ধরনের উচ্ছেদ আছে। তা হয়ে চলেছে আজ দু-দশক ধরে। এর হার খুবই বেড়ে গেছে গত কয়েক বছর। এই উচ্ছেদ চলছে আজকের যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে।

জনসমাজের ভেতর থেকে তৈরি হওয়া বাজারি 'উচ্ছেদ' — যুগের হাওয়া

প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে, কলোনির টালি বা অ্যাসবেসটসের চালের একতলা ঘর ভেঙে সব ফ্ল্যাট হচ্ছে। এই ফ্ল্যাট হবার মানে দাঁড়াচ্ছে, ওইসব ঘরগুলোর ভাড়াটে উঠে যাওয়া। নোনাডাঙায় উচ্ছেদ হওয়া পল্লিগুলিতে একাধিক এরকম ঘর পাওয়া যাচ্ছে, যারা বছরের পর বছর ধরে ভাড়া থেকেছে দক্ষিণ কলকাতার বিভিন্ন কলোনি বা অন্যান্য জায়গায়। সেইসব ছোটো ঘর ভেঙে যাচ্ছে, হচ্ছে ফ্ল্যাট। ভাড়া বাড়ছে। আজ থেকে দুবছর আগেও যেখানে ৭০০/৮০০ টাকায় থাকা যেত, এখন তার ভাড়া বেড়ে হচ্ছে দেড় হাজার। ছোটো ছাদওলা ভাড়া ঘরে কম পয়সায় ভাড়া থাকলে আরও অনেক সমস্যা তৈরি হচ্ছে। ফ্যামিলি একটু বড়ো হলে ভাড়া দিতে চাইছে না বাড়িওয়ালা। পায়খানা জ্যাম হয়ে যাবার সমস্যা, জল বেশি ব্যবহার করা নিয়ে কথা উঠছে। আগে এলাকায় পুকুর থাকায় জলের সমস্যা হত না। এখন পুকুরগুলোও বুজিয়ে দেওয়ার ফলে জলের সমস্যা বেড়ে গেছে কয়েকগুণ।

এভাবে কলকাতা শহরের যারা বস্তি ছাড়া অন্য জায়গায়, কলোনির মধ্যে বা পাড়ার মধ্যে ভাড়া থাকত, তাদের মধ্যে যারা অর্থনৈতিক মান বাড়াতে পারেনি, তারা উঠে চলে যাচ্ছে শহর কলকাতা থেকে। পাড়া বদলে বদলে কম ভাড়ার পাড়ার খোঁজ করতে করতে গড়িয়া, নরেন্দ্রপুর হয়ে এখন আরও দক্ষিণগামী মানুষ।

এসব সমস্যাগুলির সূচনা কবে জানি না, তবে ১৯৯০-এর দশকের শুরু থেকে এই অবস্থা আমি নিজেই দেখেছি। আর এই সমস্যা, বিশেষত বাড়ির ভাড়াবৃদ্ধি চরম আকার নিয়েছে গত ৫-৭ বছর ধরে।

উচ্ছেদ হওয়া আর হতে চলা মানুষের ফারাক

শহর কলকাতা থেকে পশ্চিমে আর দক্ষিণে সরছে সাধারণ মানুষ। পশ্চিমে সরছে সরাসরি উচ্ছেদ হয়ে। দক্ষিণে সরছে বেশি ভাড়া টানার ক্ষমতা না থাকায়। এই দুই ধরনের মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার ফারাক উনিশ বিশ। কিন্তু এটাই সাধারণ মানুষের চিরাচরিত অর্থনৈতিক অবস্থা। আমাদের উঁচুতলার সমাজের অসহনীয় ভোগবহুল জীবনযাপনের সহায়ক অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একেই 'গরিব মানুষ' বলা হয়ে থাকে। অদ্ভুত আমাদের দেশ! দেশের বেশির ভাগ মানুষকে গরিব মানুষ বলা হয়! বোঝাই যায়, আমাদের দেশে যারা লেখে বা বলে, সওয়াল জবাব করে, তারা কারা!

কলকাতার ফ্ল্যাটবাসীও কি নিরাপদ? যারা শহর কলকাতার ফ্ল্যাটগুলি কিনছে, তারা প্রায় সবাই কিনছে ধারে। কোনো সরকারি বা বেসরকারি মোটা মাইনের চাকরিই তাদের ফ্ল্যাট কেনার কারণ। কিন্তু যদি চাকরিতে কোনো সমস্যা হয়? দেশের আর্থিক বৃদ্ধির যে সোনালী রেখা এই উঠতি মানুষের বল, তা যদি নামতে শুরু করে আজ বাদে কাল? জানি তাহলে টিটি পড়ে যাবে। কারণ জনসংখ্যার ভাগ হিসেবে এই অংশটি ছোটো হলেও (যদিও মোট সংখ্যায় তারা কম নয়, আমাদের দেশের বিপুলাকার জনসংখ্যার কারণে) সমাজের বলিয়ে-কইয়ে এলিট লোকেদের মধ্যে এরাও আছে! কিন্তু বছর চারেক আগে থেকে আমেরিকা বা ইউরোপে যা শুরু হয়েছে (এবং চলছে), চাকরির বাজারে মন্দা, বেকারত্ব, চাকরি হ্রাস, কোম্পানি দেউলিয়া হয়ে যাওয়া — এবং তার সাথে সাথেই ব্যাঙ্কের লোন শোধ করার ক্ষমতা কমে যাওয়া — তাহলে তো ওই ইউরোপ আমেরিকার মতো 'কেনা' ফ্ল্যাট ছেড়ে দিয়ে চলে আসতে হবে মাটিতে! হয়তো ওসব দেশের মতো তাঁবু খাটিয়ে থাকতে হবে না, কিন্তু আবার ফিরতে তো হবে 'ভাড়া' ঘরে! আজকের উঠতি কাল পড়তি হলে কলকাতা আর তাকে রাখবে তো?

থাকতে পারবে তো পুনর্বাসনের ফ্ল্যাট পাওয়া শহর কলকাতার অন্তত চল্লিশ হাজার মানুষ? এরই মধ্যে নোনাডাঙার আশি একর জমি (যার মধ্যে পুনর্বাসনের ফ্ল্যাটও আছে) বাণিজ্যকেন্দ্রের জন্য সরকার কর্পোরেটদের দিয়ে দিয়েছে — এরকম কথা হাওয়ায় উড়ছে। একজন পুনর্বাসনের ফ্ল্যাটবাসী বলছিলেন, আমাদের মনে হয় বলবে, যাও বাসন্তী (সুন্দরবন) চলে যাও!

খোদ প্রধানমন্ত্রীর কথাতেই গ্রাম থেকে শহর অভিমুখে মানুষের চলে আসা এবং তার জন্য যে দায়ী স্বাধীনতা পরবর্তী সরকারি নীতি — তার স্বীকৃতি আছে, তা আমরা আগেই দেখেছি। বাজারের নিয়মে সেই শহর থেকে ছলে বলে কৌশলে সাধারণ মানুষের বাস উঠে যাওয়ার ঘটনাও আমরা দেখেছি। কিন্তু খোদ সরকারি পরিকল্পনাতেই শহর থেকে সাধারণ মানুষকে ঠেলে সরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটি নতুন। সরকার, আইনব্যবস্থা, প্রশাসন প্রভৃতি আপাত নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানগুলির যে দ্রুত কর্পোরেটকরণ হচ্ছে, নিঃসন্দেহে এগুলি তার নমুনা। আর এই আমূল ব্যবস্থাটির কর্পোরেটকরণের পরিপ্রেক্ষিতে 'পুনর্বাসনের জাতীয় নীতি' (ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হয়েছে ২০০৩, ২০০৭ এবং ২০০৯ সালে) — যাতে বলা আছে, উন্নয়নের জন্য খুব কম উচ্ছেদ করতে হবে, পুনর্বাসন না দিয়ে উচ্ছেদ করা যাবে না — এইসব ভালো ভালো কথা — সেগুলি এই কর্পোরেট-শহর গড়ে তোলার পথকে কাঁটামুক্ত করারই প্রয়াস ছাড়া আর কিছু বলে মনে হয় কি? একই সরকারের দুই নীতি : 'বস্তিমুক্ত শহর' এবং 'পুনর্বাসন' এবং গত কয়েকবছরে তাদের ব্যবহারিক প্রয়োগকে পাশাপাশি রাখলে কী মনে হয়? পুনর্বাসনের ব্যাপারটি এক অপ্রকৃতিস্থ, অসহনশীল, অদূরদর্শী, দেখনদারি শহর গড়ে তোলার এলিট খোয়াবে বিবেকের হাত ধুয়ে ফেলার চেয়ে বেশি আর কিছু কি? আমাদের এলিট পার্টি-মিডিয়া-এনজিও-র প্রতিবাদী রাজনীতি কি কর্পোরেট আগ্রাসনের মুখে দাঁড়িয়ে এর চেয়ে বেশি কিছু করতে পারছে? আরও একটা প্রশ্ন সাথে সাথেই চলে আসে : সাধারণ মানুষের টিকে থাকার লড়াই কি মেনে-মানিয়ে চলা আর মাঝে সাঝে ইতি উতি সাময়িক প্রতিরোধের মধ্যেই থেমে থাকছে না? নিজেদের সীমাবদ্ধতাগুলিকে স্বীকার করে এই দুয়ের মধ্যে সমানে সমানে সংলাপ হতে পারছে কি?

বন্দিমুক্তির আবেদনের ভঙ্গিমা প্রসঙ্গে ... ২ পৃষ্ঠার শেষাংশ

এই প্রসঙ্গে আমরা আপনার কাছে কয়েকটি প্রশ্ন রাখতে চাই :

আপনি এবং অন্যান্য বিজ্ঞানী ও বিদ্বজ্জনেরা ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংকে যে চিঠি দিয়েছেন, সেখানে পার্থ সারথী রায়কে এমনভাবে eminent and internationally acclaimed scientist হিসেবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং অন্যদের সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি, তাতে পার্থসারথী রায়ের বিষয়টি মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব পেয়েছে এবং কর্পোরেট মিডিয়া তাঁকে অন্যদের থেকে আলাদা করে নিয়ে কভারেজ দিয়েছে এবং রাষ্ট্র/সরকার আন্দোলনের প্রতি সহমর্মী শক্তিকে বিভক্ত করার কাজে সুবিধা পেয়েছে।

শ্রমজীবী মানুষের একটি আন্দোলনে যদি সাধারণ মানুষ ও রাজনৈতিক কর্মীরা যুক্ত থাকে, কোনো একজনের বিজ্ঞানী পরিচয়কে আলাদাভাবে গুরুত্ব দেওয়া কি সমীচিন? কেন একজনকে তাঁর বিজ্ঞানী পরিচয়ের জন্য আলাদাভাবে মুক্তি দেওয়া হবে? আর সেই একই মামলায় অন্যদের গরাদের ভিতর রেখে দেওয়া হবে? একই ঘটনা ঘটেছিল বিনায়ক সেনের মুক্তির ইস্যুতে। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে তিনজনকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। সেই ইস্যুতে অন্যদের পাশাপাশি আপনার স্বাক্ষরিত একটা আবেদন এসেছিল। সেই আবেদনে কেবল বিনায়ক সেনের মুক্তির দাবিকেই রাখা হয়েছিল। এখনকার আবেদনে 'অন্যান্যদের' উল্লেখ রয়েছে বটে, কিন্তু 'বিজ্ঞানী' পার্থসারথীর ওপর অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

এই আবেদনে রাষ্ট্রকে 'বিবেকের স্বর' রুদ্ধ না করার কথা বলা হয়েছে এবং এটাও বলা হয়েছে যে 'বিশেষত যখন সেই স্বর এমন ব্যক্তিদের তরফ থেকে আসছে, যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশিষ্ট অবস্থান নিয়ে রয়েছে'। আইন ও রাষ্ট্রের চোখে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার বিষয়ে কেন 'বিশিষ্ট অবস্থান নিয়ে থাকা' ব্যক্তিরা বিশেষ সুবিধা পাবে? এটা কি বিশ্বের শিক্ষিত ভদ্রলোকেদের দ্বারা প্রকাশিত এলিটিজ্‌ম নয়, যাকে রাষ্ট্র ও কর্পোরেটেরা পরোক্ষভাবে স্বীকার করে আর মদত দেয়?

মানব সমাজ কি ইতিমধ্যেই সমবেতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে একজন 'বিশিষ্ট' বিজ্ঞানী অথবা একজন 'বিশিষ্ট' চিকিৎসক একজন দিনমজুর বা ভবঘুরের চেয়ে বেশি স্বাধীনতা ভোগ করবে? এটা কি ইতিমধ্যেই স্থির হয়ে গেছে যে একজন বিজ্ঞানী মানব সমাজ এবং ধরিত্রীমাতাকে একজন শ্রমিকের চেয়ে বেশি ভালোবাসে? আমরা যেটা দেখতে পাই, আমাদের পৃথিবীর কিছু 'বিশিষ্ট' ও 'প্রতিষ্ঠিত' বিজ্ঞানী পরমাণু অস্ত্র আর পরমাণু শক্তির জন্য এই মুহূর্তে ভয়ঙ্করভাবে ওকালতি করছে, এটা পর্যন্ত বলছে যে 'তেজস্ক্রিয়তা মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো'।

যখন আমরা 'বিশিষ্ট অবস্থান'–এর বিশেষত্বের কথা শুনতে পাই, আমাদের সন্দেহ বেড়ে যায়। আজকের দুনিয়ায় বড়ো পুরস্কার, প্রকল্প, ফেলোশিপ, পদ, কমিটির সদস্যপদ কিংবা সামগ্রিকভাবে বিশিষ্টতা বেশি বেশি করে রাষ্ট্র এবং কর্পোরেট পুঁজির হাতিয়ার হয়ে উঠছে। কারণ একটাই, বিক্ষোভকে প্রশমিত করো অথবা হজম করে ফেলো। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ দীর্ঘকাল যাবৎ এটা দেখে আসছে। বাস্তবে এমন এক বিভক্ত সমাজ আকার নিচ্ছে, যেখানে কর্পোরেট বা সরকারি/আধা সরকারি ক্ষেত্রগুলিতে একদল লোকের মোটা পে প্যাকেট, যাকে অরুন্ধতী রায় নাম দিয়েছেন কর্পোরেট সোসাইটি। আলোচ্য আবেদনে বিবেকের স্বরকে রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা এমন এক দেশে বাস করি যেখানে দশকের পর দশক ধরে সরকার–নিরপেক্ষভাবে নিপীড়িতদের স্বরকে হিংস্রভাবে দমন করা হয়। তাই এখানে বিবেকের স্বরগুলিকে রক্ষা করা নিঃসন্দেহে আলঙ্কারিক এবং এক সমতাবাদী সমাজের পক্ষে যে কোনো সমবেত সংগ্রামের বিরুদ্ধে যায়।

এই ৭ জনের মধ্যে অন্তত একজন মহিলাকে মাওবাদী হিসেবে অভিযুক্ত করে তাঁর বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর আইন UAPA প্রয়োগের মতলব করেছে রাষ্ট্র ও সরকার। আমি এখানে আরও অনেক মানুষের মতো মাওবাদী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নই বা সেই রাজনীতির সমর্থক নই। যেমন, আমি যতদূর জানি আপনিও ওই ধরনের রাজনীতিতে উৎসাহী নন। কিন্তু রাষ্ট্র যখন একটা অন্যায় করে, যখন সেই অন্যায়কে ন্যায় হিসেবে সমাজের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার জন্য কারও ওপর অত্যাচার করে, বন্দী করে, আমরা রাষ্ট্রের সেই অ্যাকশনকে নিন্দা করি। এখানে ৭ জনের মুক্তির দাবি একই সঙ্গে ওঠা উচিত। কারণ এঁরা কেউই উচ্ছেদ হওয়া বস্তিবাসীদের প্রতি হাত বাড়িয়ে দিয়ে কোনো অন্যায় করেননি। কারো কোনো ক্ষেত্রে কোনো 'বিশিষ্টতা' থাকলে নিশ্চয়ই তিনি আলাদা কোনো সুবিধা পেতে পারেন না।

আমরা সাধারণ মানুষ হিসেবে আপনার মতো একজন সংবেদনশীল জনপ্রিয় বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে খোলাখুলি আমাদের মত বিনিময় করতে চাই। আমরা চাই আমাদের কথাগুলি আপনি গভীরভাবে চিন্তা করুন। কারণ গৃহহীনতা এবং অস্থায়ী আশ্রয় থেকে উচ্ছেদের সমস্যা আজ কোনো দেশ বা রাষ্ট্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সমস্ত পৃথিবী আজ এই সমস্যায় জড়িয়ে পড়েছে। এর প্রতিরোধও একটি গ্লোবাল সাবজেক্ট। তাই আমরা বিশ্বস্তরে এর সমস্ত খুঁটিনাটি দিক নিয়ে আলাপ করতে চাইছি।

শমীক সরকার ও জিতেন নন্দী
মন্থন সাময়িকী পত্রিকার সম্পাদকীয় কর্মী

পুনশ্চ : সংযোজন : সরকার নিম্ন আদালতে অন্য চারজনের জামিনের আবেদনের বিরোধিতা করেনি এবং বাকি দুজনকে পুলিশি হেফাজতে রাখার অনুমতি চায়। আদালত তা মঞ্জুর করে। খবরে প্রকাশ, বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার নোনাডাঙার ৮০ একর জমি কর্পোরেট গোষ্ঠীগুলিকে বিক্রি করতে চলেছে।

২৬ এপ্রিল ২০১২

আপনাদের তথ্যপূর্ণ চিঠির জন্য অত্যন্ত ধন্যবাদ জানাই। ন্যাশনাল কমিশন অন ফার্মার্স–এর রিপোর্টটি পাওয়ার মতো কোনো সূত্রের খোঁজ আপনাদের আছে কি? কিংবা আপনার বর্ণিত বিষয়ে প্রকাশিত (অথবা পোস্টেড) কাগজপত্র কিছু আছে?

আমার মতে আপনাদের সমালোচনা যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য। কিন্তু এতে আমাকে উদ্দেশ্য করে অথবা যারা (আমার মতো) ভারতীয় কর্মী বন্ধুদের সুপারিশে এতে স্বাক্ষর করেছে তেমন কিছু নেই। যদিও তারা (আমার মতো) আবেদনে যতটুকু আছে তার বাইরে এইসব বিষয়ে প্রায় কিছুই জানে না। যারা আমাদের কাছে আবেদনে স্বাক্ষর করার জন্য অনুরোধ করেছে, আমরা তাদের চিনি, তাই বিশ্বাস করেছি। এই আবেদনটি লেখার ব্যাপারে এদের কোনো ভূমিকা নেই।

গণতান্ত্রিক ও মানবাধিকারের বিষয়ে কোনো না কোনো আকারে প্রায়শই এই সমস্যা উঠছে। সেক্ষেত্রে হয় কেউ গবেষণা না করে (কার্যত অসম্ভব) এতে সই দেবে না, আর নয়তো নির্ভরযোগ্য সূত্রের ওপর বিশ্বাস করবে। যারা এই আবেদনটি লিখেছে, সংগঠিত করেছে এবং ছড়িয়ে দিয়েছে, তাদের প্রতি সমালোচনা হওয়া উচিত। এইসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে তারাই উপকৃত হতে পারে।

নোয়াম চমস্কি

২৭ এপ্রিল ২০১২

আপনাদের পয়েন্টটা খুবই যথাযথ। আমি ঠিক এইভাবেই ভেবেছি। স্পষ্টত, নোয়াম চমস্কি কিছুটা অস্বস্তিতে পড়েছেন, কিন্তু তিনি প্রশ্নটাকে অন্যদের দিকে ঘুরিয়ে দিতে চান। আপনারা হয়তো ভবিষ্যতে ওঁর দিক থেকে আরও সতর্কভাবে শব্দচয়ন আশা করতে পারেন, কিন্তু তিনি মূলগতভাবে কোনো ভুল করেছেন বলে মনে করেন না।

দেবাশিস সেনগুপ্ত

জিতেন

এই চিঠিপত্রগুলি শেয়ার করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। যে নীতির ওপর আপনি প্রশ্ন তুলেছেন আমি তা বুঝি এবং তাকে সমর্থন করি। যখন অনেককে মিথ্যা অভিযুক্ত করা হচ্ছে, তখন একজন বা কয়েকজনের ব্যক্তিগত সুযোগগুলি তাদের সুবিধার্থে ব্যবহার করা উচিত নয়, এটা আমার কাছে পরিষ্কার নয়।

আমার নিজের স্পষ্টতার জন্য আমাকে আরও ভাবতে হবে।

আরতি চোকশি

আমার কাছে চিঠিটা বোকার মতো। এটা সচেতনতা তৈরি আর আন্তর্জাতিক প্রচারাভিযানের একটা পন্থা। এই যুক্তিতে, আমি যদি এসমস্ত রাজনৈতিক বন্দির মুক্তি নিশ্চিত না করতে পারি, তাহলে একজনের মুক্তি নিশ্চিত করা উচিত নয়; যদি আমি সমস্ত মৃত্যুদণ্ড রদ না করতে পারি, আমি একজনের জন্য প্রচার করতে পারি না।

কুনাল চট্টোপাধ্যায়

২৮ এপ্রিল ২০১২

জিতেন

আমি আপনাদের তোলা পয়েন্টটার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু চমস্কিকে লেখার মাধ্যমে এটা কেন তোলা হচ্ছে? এর ফলে তর্কটা অ্যাকাডেমিক হয়ে যাচ্ছে। যদি এটা কোনোভাবে আবেদনের লেখকদের কাছে তোলা যেত, হয়তো একটা রাজনৈতিক সংলাপ গড়ে উঠতে পারত। এরকম ধরনের বিষয়ে সেটা সবচেয়ে কাম্য।

সুনীল সহস্রবুদ্ধে

শ্রীমতী অরুণা রায়ের প্রতি

পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক গ্রেপ্তারির সঙ্গে যুক্ত আবেদনের সমালোচনা করে আমরা আবেদনের অন্যতম স্বাক্ষরকারী নোয়াম চমস্কিকে একটি চিঠি পাঠিয়েছি। তিনি আবেদনের সংগঠকদের প্রতি চিঠি লেখার জন্য আমাদের অনুরোধ করেছেন। আমরা জানি না কারা এটি সংগঠিত করেছেন। তাই আমরা প্রথম স্বাক্ষরকারী হিসেবে আপনার কাছে চিঠিটা পাঠাচ্ছি। যদি আপনি অন্য স্বাক্ষরকারীদের কাছে, বিশেষত সংগঠকদের কাছে এটা পাঠিয়ে দেন, তাহলে উপকৃত হব।

দয়া করে চিঠির প্রাপ্তিস্বীকার করবেন।

শমীক সরকার ও জিতেন নন্দী
মন্থন সাময়িকী পত্রিকার সম্পাদকীয় কর্মী

বন্ধু জিতেন নন্দী

আমি আপনাদের তোলা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক পয়েন্টের সঙ্গে একমত — আবেদন তৈরির ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক মনোভাব (কেবল বিনায়ক সেন, পার্থসারথী রায় এবং একই ধরনের পরিবেশ থেকে আসা সুপরিচিত ব্যক্তিদের মুক্তি চাওয়া; অথচ অখ্যাত দরিদ্র শ্রেণী থেকে অংশ নেওয়া অধিকাংশ মানুষ, যাদের আইনি সহযোগিতা নেই এবং যাদের মুক্তির জন্য আন্তর্জাতিক সমর্থন নেই, তাদের প্রতি অবহেলা করা)। কিন্তু নোয়াম চমস্কিকে (যিনি এই ধরনের আবেদনের ব্যপকতর মাত্রা সম্পর্কে অবহিত থাকবেন বলে আশা করা যায় না) দায়ী না করে আমি বলব, ১. যারা এই ধরনের আবেদন তৈরি করবে তারা এইসব আন্দোলনে ধৃত বিখ্যাতদের পাশাপাশি যারা অখ্যাত গ্রামবাসী/বস্তিবাসী তাদেরও নাম অন্তর্ভুক্ত করবে এবং সকলের মুক্তি দাবি করবে; ২. যারা স্বাক্ষরকারী, তারাও এই ধরনের আবেদন বা তার খসড়া পেলে বিখ্যাতদের তালিকার সঙ্গে সাধারণ আন্দোলনকারীদের নাম যুক্ত করার অনুরোধ করবে।

সুমন্ত ব্যানার্জি

শমীক ও জিতেন

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো তোলার জন্য ধন্যবাদ। এটাও ভালো যে অধ্যাপক চমস্কি এই ধরনের বিবৃতিতে সই করেছেন এবং তাঁদের মতো লোকের পক্ষে অত দূর থেকে এই পরিস্থিতির বিভিন্ন দিকগুলো বোঝা ও মূল্যায়ন করার অসুবিধাকেও তিনি স্বীকার করেছেন। অসুবিধাটা হল মূলত অসম 'গুরুত্ব'–এর মানুষদের ব্যাপারটায় হস্তক্ষেপ করা। আমাদের চালু সামাজিক মনের গড়নে 'বিদ্বান', 'শিক্ষিত', 'সংস্কৃতিবান', 'মার্জিতরুচিসম্পন্ন' ইত্যাদিদের অসম মূল্য দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু মানবিক ও গণতান্ত্রিক অধিকারের ক্ষেত্রে প্রশ্নটা মানবিক ও গণতান্ত্রিক হওয়া নিয়ে। যে ধরনের মনের গড়নের ইঙ্গিত আমি দিতে চাইছি, সেখানে প্রায়শই এমন হতে পারে যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগগুলিও গুণগতভাবেই আলাদা। তাই এখনকার মতো আমাদের খোলা মনে চলতে হবে এবং যখনই এই ধরনের জিনিসগুলো নজরে আসবে (এমনকী তা যতই সঠিক উদ্দেশ্যে হোক না কেন), আমাদের অতিরিক্ত কঠোর না হয়ে বিনম্রভাবে সেটার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। তর্কটা চলতে থাকুক।

সৌরীন ভট্টাচার্য

শমীক সরকার ও জিতেন নন্দী

আপনাদের চিঠির প্রাপ্তিস্বীকার করছি, দেরি হওয়ার জন্য দুঃখিত। আমি গত সপ্তাহে রাজস্থানের গ্রামে ছিলাম, ইন্টারনেটের যোগাযোগ ছিল না।

আপনারা জানেন, আমার কাজে পশ্চিমবঙ্গ প্রায় আসে না। আমি বৃহত্তর ইস্যুগুলো জানি, কিন্তু বহু সংগ্রামের বিশদ জানি না।

এই আবেদনটি উঠেছিল বিজ্ঞানী সমাজের ভিতর থেকে, যাঁরা পি কে রায়ের মতো একজন খুবই প্রতিশ্রুতিবান মাইক্রো–বায়োলজিস্টের গ্রেপ্তারিতে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। ...

অরুণা রায়

মন্থন সাময়িকী : ২০১১ সালের আয়-ব্যয়ের হিসেব

সংখ্যা/মাস	মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা	প্রতি কপির দাম (টাকা)	মোট কত কপি ছাপা হয়েছে	বিতরণ (কত কপি, কীভাবে)						কত কপি অবিক্রিত	বিক্রি বাবদ মোট আয় (টাকা)	বিজ্ঞাপন বাবদ আয় (টাকা)	মোট আয় (টাকা)
				গ্রাহক	সৌজন্য	নগদে বিক্রি (কপি)	আয় (টাকা)	স্টলে বিক্রি (কপি)	৩০% ছাড়ে আয় (টাকা)				
প্রথম জানু-ফেব্রু	৩২	৮.০০	৫৫০	১৭০	২২	২০৫	১৬৪০.০০	১০২	৫৭১.০০	৫১	২২১১.০০	---	২২১১.০০
দ্বিতীয় মার্চ-এপ্রিল	২৪	৬.০০	৫১৭	১৭০	২২	১৫০	৯০০.০০	৮৫	৩৫৭.০০	৯০	১২৫৭.০০	---	১২৫৭.০০
তৃতীয় মে-জুন	২৪	৬.০০	৫১১	১৭০	২২	১৫২	৯১২.০০	৯৬	৪০৩.০০	৭১	১৩১৫.০০	২০০.০০	১৫১৫.০০
চতুর্থ জুলাই-আগস্ট	৩২	৮.০০	৫১২	১৭০	২৩	১৫০	১২০০.০০	১০০	৫৬০.০০	৬৯	১৭৬০.০০	---	১৭৬০.০০
পঞ্চম সেপ্টে-অক্টো	৩০	৮.০০	৫২৪	১৭০	২৩	১৮০	১৪৪০.০০	১০৬	৫৯৪.০০	৪৫	২০৩৪.০০	---	২০৩৪.০০
ষষ্ঠ নভে-ডিসে	২৪	৬.০০	৫১০	১৭০	২২	১৬০	৯৬০.০০	১০১	৪২৪.০০	৫৭	১৩৮৪.০০	---	১৩৮৪.০০
পুস্তিকা জাপানে কী ঘটে চলেছে	১৬	৮.০০	২০০০	---	২২	১৫০৪	১২০৩২.০০	৪০৫	২২৬৮.০০	৯১	১৪৩০০.০০	২০০০.০০	১৬৩০০.০০
মোট							১৯০৮৪.০০		৫৯৭৭.০০		২৪২৬১.০০	২২০০.০০	২৬৪৬১.০০

সারা বছরের মোট আয় : ডাক গ্রাহক ৭৫০০.০০, সরাসরি গ্রাহক ৮০০.০০, অনুদান বাবদ ৯০০.০০, স্টলে বিক্রি বাবদ ৫১৭৭.০০, নগদে বিক্রি বাবদ ১৯০৮৪.০০; বিজ্ঞাপন বাবদ ২২০০.০০ টাকা; মোট আয় : ৩৫,৬৬১.০০ টাকা।

সংখ্যা/মাস	কত কপি ছাপা হয়েছে	পৃষ্ঠা সংখ্যা	ডিটিপি খরচ (টাকা)	ছাপার খরচ (টাকা)	কাগজের খরচ		বাঁধাই খরচ (টাকা)	অন্যান্য খরচ ফোটো, জেরক্স বহন ইত্যাদি (টাকা)	ডাক খরচ (টাকা)	মোট খরচ (টাকা)
					নিউজপ্রিন্ট (টাকা)	মলাট বাবদ (টাকা)				
প্রথম জানু-ফেব্রু	৫৫০	৩২	১১২০.০০	১০০০.০০	৭৮০.০০	৪৫০.০০	৩০০.০০	১৫.০০	৩০০.০০	৩৯৬৫.০০
দ্বিতীয় মার্চ-এপ্রিল	৫১৭	২৪	৮৪০.০০	৭৫০.০০	৬০৫.০০	৪২০.০০	৩০০.০০	১৫.০০	৩০০.০০	৩২৩০.০০
তৃতীয় মে-জুন	৫১১	২৪	৮৪০.০০	৭৫০.০০	৫৬২.০০	৩৭৪.০০	৩০০.০০	১৫.০০	৩০০.০০	৩১৪১.০০
চতুর্থ জুলাই-আগস্ট	৫১২	৩২	১১২০.০০	১০০০.০০	৮১৪.০০	৪৭১.০০	৩০০.০০	২০.০০	৩০০.০০	৪০২৫.০০
পঞ্চম সেপ্টে-অক্টো	৫২৪	৩০	১০৫০.০০	৯৬৫.০০	৭৭৭.০০	৩৮৪.০০	৩৫০.০০	২০.০০	৩০০.০০	৩৭৯৬.০০
ষষ্ঠ নভে-ডিসে	৫১০	২৪	৮৪০.০০	৭৫০.০০	৬৪৫.০০	৪৫০.০০	৩০০.০০	২০.০০	৩০০.০০	৩৩০৫.০০
পুস্তিকা জাপানে কী ঘটে চলেছে	২০০০	১৬	৩০০.০০	৫৬০০.০০	আর্ট পেপার ৩১৮০.০০	------	৫০০.০০	সেটিং ৩০০.০০	----	৯৮৮০.০০
মোট										২৯,৩৪২.০০

সারা বছরের মোট ব্যয় : বিবিধ খরচ ৮৬৬.০০ (ফুকুশিমা বিপর্যয় সম্পর্কিত কর্মসূচির খরচ ২৬৬.০০, অ্যানুয়াল রিটার্ন বাবদ ৩০০.০০, পুজো বখশিস ৩০০.০০), ২০১১ সালের ছয়টি সংখ্যা এবং জাপানের পুস্তিকা প্রকাশের মোট খরচ ২৯৩৪২.০০; মোট ব্যয় : ৩০,২০৮.০০। ২০১০ সালের শেষে হাতে ছিল ৬০৪.২০; ২০১১ সালের শেষে

স্বত্বাধিকারী জিতেন নন্দী কর্তৃক সি-৫৬৪, ফতেপুর প্রথম সরণী, গার্ডেনরীচ, কলিকাতা-২৪ হইতে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং আর্ট, কলি-৯ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক জিতেন নন্দী।

ওয়েবসাইট : **http://manthansamayiki.googlepages.com** ই মেল : **jiten_nandi@vsnl.net** দূরভাষ : **2491 3666**

হাতে আছে মোট ৪৮৪৮.৮০ টাকা।